একা আমি

শেখ আবদুল হাকিম

Banglapdf.net

প্রজাপতি প্রকাশন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

একা আমি

সেবা রোমান্টিক

শেখ আবদুল হাকিম

স্ক্যানিং এবং এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

Website – Banglapdf.net

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ

একা আমি ঃ

শেখ আবদুল হাকিম

বিদায়, বন্দর নগরী -

তোমার তীরে আমার তরী ভিড়ল না।

বিদায় তারিক -

তোমার গানের পাখি হবার সাধ এ-জীবনে আর মিটল না।

ব্যর্থতার গ্লানি ও কলঙ্কের মিথ্যে অপবাদ আমার জীবনটাকে

পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

নিয়তির এ কী পরিহাস! কেন দেখা হল আমার ওর সাথে?

কেন বুঝিনি, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না?

আমার প্রেম ও স্বপ্ন, সব এই বিলাসভবনে ফেলে যাচ্ছি।

যাচ্ছি চিরকালের জন্য।

অনেক কষ্টে আটকে রেখেছি চোখের পানি,

আমি কাঁদলে ওর যদি অমঙ্গল হয়।

সুখী হও, তারিক।

ভাল থেকো।

একা আমি

শেখ আবদুল হাকিম

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
১৯৯৫
প্রচ্ছদ
আলীম আজিজ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

EKA AMI
By: Sheikh Abdul Hakim
ISBN-984-462-047-3
মূল্য ॥ চল্লিশ টাকা

নিয়াজ মোরশেদকে

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে

আরও কটি উপন্যাস ঃ

খন্দকার মজহারুল করিম

সবুজ ঘাসের দ্বীপ, সেই চোখ, তোমার জন্যে, অনুরূপা, চন্দনের বনে, দূর আকাশের তারা, আমরা দুজনে, একটি মাধবী, নও শুধু ছবি, অতল জলের আহ্বান, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, সোনালি গরল, অধরা মাধুরী, জানিনা কখন, আমার এ ভালোবাসা, কেন ডাকো, সন্ধ্যার মেঘমালা, এসো আমার ঘরে, ঝড়ের রাতে, ছায়া ঘনায়, কঙ্কাবতী, তোমাকে ভালবেসে, একটুখানি চাওয়া।

শেখ আবদুল হাকিম

হায় চিল, রজনী চঞ্চলা, বান্ধবী, সুচরিতাসু, মধুযামিনী, তমা, অন্তরা, প্রথম প্রেম, যে ছিল আমার, প্রিয়, তুমি সুন্দর, কি শুভক্ষণে, তুমি চিরকাল।

আলী মাহমেদ

কনক পুরুষ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

এ বাড়িতে আমার আর থাকা চলে না। সব ফেলে চলে যাচ্ছি আমি। ব্যর্থতার জ্বালা ও কলঙ্কের মিথ্যে অপবাদ আমার তেইশ বছরের শুভ্র সুন্দর জীবনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। লজ্জায় কোনদিন আমি আর ওর সামনে দাঁড়াতে পারব না। জুন মাসের এই সাত তারিখে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী মেয়ে আমি। আজ ভাবি, নিয়তির এ কি পরিহাস, ওর সাথে আমার দেখা হলো কেন! আর আমিই বা বোকার মত ওকে পেতে চাইলাম কেন! আগে কেন বুঝিনি, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না?

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কথার মতই ছিল ব্যাপারটা। 'তারে আমি চোখে দেখিনি···।' সত্যি দেখিনি, সে শুধু আমার স্বপনে এসেছিল। তারপর ওকে আমি দেখলাম। দেখেই পাগল হয়ে গেলাম। মনে হলো, তেইশটা বসন্ত ধরে তিলে তিলে এত যত্ন করে গড়ে তুলেছেন আমাকে বিধাতা, তা শুধু ওরই জন্যে। মনে হলো, আমার জীবন ও যৌবন সার্থক হতে পারে শুধু যদি ওর মাঝে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করে দিতে পারি। তখন বুঝিনি, ওই বিশেষ মুহূর্তটি ছিল আমার জন্যে অভিশপ্ত, জীবনটা ধ্বংস হবার সূচনাপর্ব। বুঝিনি, দুনিয়ার বুকে আমার জন্মই হয়েছে ব্যর্থ ও অসুখী হবার জন্যে।

আমার প্রেম ও স্বপ্ন, সব এই বিলাসভবনে ফেলে যাচ্ছি। যাচ্ছি চিরকালের জন্যে, কোন দিন আর ফেরা হবে না। ও সুখে থাকুক, অন্তরের অন্তস্তল থেকে এই কামনা করি। যেখানে, যতদূরে, যে-অবস্থাতেই থাকি, আমি ওর জন্যে প্রার্থনা করব। প্রিয় আমার, কোন অমঙ্গল যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে। সুখী হও, তারিক। ভাল থেকো। আমি নগণ্য একটি মেয়ে, আমার কথা ভুলে যেয়ো তুমি। ভুলে যেয়ো শিমুল নামে অতি সাধারণ একটি মেয়ে তোমার জীবনে কখনও এসেছিল।

কাল সারাটা রাত আমি ঘুমাইনি। এখন ভোর, এত ভোরে বাড়ির কারও ঘুম ভাঙেনি। চোরের মত চুপিচুপি পালিয়ে যাবার এখনই সময়। সুটকেসটা বন্ধ করলাম, দেখলাম হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলাম। করিডর ধরে হাঁটার সময় বুকের ভেতরটা ধক ধক করছে। কেউ যদি দেখে ফেলে, লজ্জায় মরে যেতে হবে। বড় ইচ্ছে করছে, তোমাকে শেষ একবার দেখে যাই। তোমাকে, যাকে আমি আমার সমস্ত কিছু দিয়ে ভালবেসেছি। কিন্তু না, নিজেকে দুর্বল হতে দেয়ার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। তোমার কত মধুর স্মৃতিই তো জমা হয়ে আছে আমার অন্তরে, অনন্তকাল অসুখী হয়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে সেগুলোই কি যথেষ্ট নয়!

পা টিপে টিপে হাঁটছি, কেউ যাতে পায়ের শব্দ শুনে না ফেলে। বিশেষ করে দজ্জাল মেয়েলোকটা যদি একটু আওয়াজ পান, হুইলচেয়ার নিয়ে এখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন। আমাকে চলে যেতে দেখে হাসবেন তিনি, তাঁর সে হাসি আগুন ধরিয়ে দেবে আমার শরীরে। বিলাসভবনে আমার উপস্থিতি মুহূর্তের জন্যেও সহ্য করতে পারেননি তিনি। আমার সুখ ছিল তাঁর জন্যে বিষ। উফ্, মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে!

বাচ্চা দুটোকেও জানাতে চাই না আমি চলে যাচ্ছি। হাঁউমাঁউ করে কান্না জুড়ে দেবে

ওরা। ওদের চোখে পানি দেখলে নিজেকে আমি স্থির রাখতে পারব না।

একবার শুধু বড় হলঘরের মাঝখানে একটু থামলাম। আলো নেই বললেই চলে, প্যাসেজ থেকে ক্ষীণ একটু আভা আসছে শুধু। ভাল হত আজও যদি শারমিন থাকত এই ঘরে, শেষ একবার দেখে যেতাম তাকে। বড় বড় সরল দুটো চোখ, এই ঘরে আমি ঢুকলেই আমার দিকে হাসিমুখে তাকাত। শারমিন সুলতানা, তোমার জন্যে দুঃখিত আমি। আজ তোমার ছবিটা পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তুমি চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছ, আমিও যাচ্ছি, ভাই। পার্থক্য হলো, তুমি মরে বেঁচেছ, কিন্তু আজ থেকে আমি বেঁচেও মরে থাকব। এক অর্থে তুমি ভাগ্যবতী, শারমিন। তুমি তবু ওকে পেয়েছিলে। কিন্তু আমি তো সে ভাগ্য করে আসিনি। আজ তিন বছর হলো মারা গেছ তুমি, তারপর একবার তোমার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে দেয়নি ওরা। তোমার মৃত্যুর জন্যে যে-ই দায়ী হোক, বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, তার যেন নরকবাস হয়।

বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। হু হু করে উঠল বুকটা। রিক্ত, খালি লাগছে নিজেকে। সব হারানোর এই ব্যথা কি করে আমি সহ্য করব জানি না।

টুং-টাং বেল বাজিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল এক রিকশা। উঠে বসলাম রিকশায়, হুডটা টেনে দিলাম মাথার ওপর। বললাম, 'বাসস্ট্যাণ্ডে চলো, ঢাকার কোচ ধরব।'

ভাগ্য ভাল, প্রথম কোচেই একটা সীট পেয়ে গেলাম। আর ছ'ঘণ্টা পর ঢাকায় পৌঁছে যাব। ঢাকা থেকে শিমুলিয়া, গ্রামের বাড়িতে, আরও দু'আড়াই ঘণ্টার পথ। বংশী নদীর কিনারায়, ঘাটে বসে, প্রহর গুনব আমি।

চট্টগ্রামে যতদিন ছিলাম, রোজ আমি ডায়েরী লিখেছি। গ্রামের বাড়িতে বসে আরও ক'পাতা লিখতে হবে আমাকে, একটা ব্যর্থ প্রেম কাহিনীর পরিসমাপ্তি টানার জন্যে। তারপর ডায়েরী লেখার অভ্যেসটা ছেড়ে দেব। জীবন আমার কাছে আর কোন গুরুত্ব বহন করে না, এমন কিছু আর ঘটতে পারে না যা লিখে রাখার মত হবে।

কোচে বসে ঢাকায় ফেরার পথে আমার ব্যর্থতার কাহিনী এই মুহূর্তে নিজেই একবার পড়ে নিচ্ছি। আরম্ভ করেছি শুরু থেকেই। তারিক, আমার জীবন, জানি না এত সব স্মৃতি নিয়ে কি করে আমি বেঁচে থাকব। পালাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার প্রাণপুরুষকে আমি ভুলে থাকব কিভাবে!

তারিক, ডায়েরীতে আমি কত কি লিখেছি তা কি কোন দিন জানার সুযোগ হবে তোমার? কোনদিন কি তোমার জানা হবে, তোমাকে আমি কতটা ভালবাসি? তুমি কোনদিন জানবে না, শুধু যে ভালবাসি তা নয়, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত শুধু তোমাকেই আমি ভালবাসব, এবং মৃত্যুর পরও আমার প্রেম ম্লান হবে না এতটুকু। আমি তোমাকে অনন্তকাল ধরে শুধু ভালবেসেই যাব। জন্ম থেকে জন্মান্তরে, এক দুনিয়া থেকে আরেক দুনিয়ায়, আমার প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমার প্রেমে পাগল হয়ে থাকবে। জানি তোমাকে পাব না, তবু। প্রথম যেদিন তোমার সাথে আমার দেখা হলো···

দুপুর বারোটা, লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ারস কিণ্ডারগার্টেনের বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে আছি। বৃষ্টিটা এত বিরক্তিকর যে বলার নয়। হয় ঝম ঝম করে ঝরে হালকা হ, নাহয় তোর ছিঁচকান্না থামা, আর তো সহ্য হয় না বাপু। কিন্তু আমার কথা বৃষ্টি শুনবে কেন, ঝির ঝির করে ঝরেই চলেছে। আমাকে একটা রিকশা ডেকে দেয়ার জন্যে স্কুলের দারোয়ান কদম আলি কম

চেষ্টা করেনি, কিন্তু ভেজাই সার হয়েছে তার, একটা রিকশাও খালি পায়নি। শেষে আমিই তাকে ধমক দিয়ে ডেকে নিয়েছি। গরীব মানুষ, জ্বর বাধিয়ে কামাই করলে বড় আপা তার বেতন কাটবে। স্কুলের পিছনে কলতলায় গেছে সে, গোসল করবে। লোহার ছোট গেটটার একটা পাল্লা খোলা রয়েছে, রাস্তাটা বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছি আমি। মাঝে মধ্যে দু'একটা রিকশা যাচ্ছে, তবে খালি নয়। পাশের একটা দোতলা বাড়ি থেকে আমার প্রিয় গায়কের ভরাট, বিষণ্ন গলা ভেসে আসছে।

এমন তো কথা ছিল না
একলা ফেলে যাবেই যদি, এলে কেন
তোমার স্মৃতি কাঁটার মত বিঁধবে কেন
এত ব্যথা তবু কেন কাঁদতে পারি না
এলেই যদি, যাবে কেন বুঝতে পারি না।

বেশ ক'বার দেখেছি, পাশের দোতলায় আমার বয়েসী এক তরুণী আছে। এ নিশ্চয়ই তার কাণ্ড, বৃষ্টিঝরা বিষণ্ন দুপুরে ক্যাসেট প্লেয়ার ছেড়ে প্রিয় গায়কের গান শুনছে। ওঁর ফ্যানরা কত উদ্ভট কাণ্ডই যে করে। দেশের সাপ্তাহিকগুলোয় সে-সব মজার মজার কাহিনী ছাপাও হয় নিয়মিত। আমি এখনও ছাত্রী, নিজের খরচ নিজেকে চালাতে হয়, সব পত্রিকা কেনার সামর্থ্য হয় না, তবু চেয়েচিন্তে যে-ক'টা সম্ভব পড়ি বৈকি। পড়ি না বলে, বলা উচিত দেখি। ওঁকে দেখি। দেখাতেই আমার তৃপ্তি। শুধু যে পত্রিকার পাতাতেই দেখি তা নয়, স্বপ্নেও দেখি। রাজপুত্রের মত চেহারা, একবার তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। তবে আমি ওঁর অন্ধ ভক্ত হলেও, নির্বোধ বালিকার মত অবাস্তব কল্পনাকে কখনও প্রশ্রয় দিই না। স্বপ্নেও ওঁকে দেখি, কিন্তু ওঁকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনি না। অতি সাধারণ একটি মেয়ে আমি, নিজের দৌড় সম্পর্কে সচেতন। শুনেছি, গানগুলো সবই নাকি ওঁর নিজের লেখা। খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওঁর জীবনে কি এত দুঃখ যে শুধু বিষাদ, অভিমান, ক্ষোভ আর দুঃখের গানই লিখতে হয়? ওঁর জীবনে কি আনন্দ বলে কিছু নেই?

সেই একই গান নতুন করে বাজছে, এবার নিয়ে বোধহয় তিনবার। ভালই লাগছে শুনতে। সময়টাও কাটছে আমার। বৃষ্টিটা সহজে থামবে বলে মনে হয় না।

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে এগারোটায়। ছুটির পরপরই যদি বেরিয়ে পড়তাম, বৃষ্টি নামার আগেই পৌঁছে যেতাম হোস্টেলে। ক্লাসরুম খালি পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা দেখছিলাম, জানতেও পারিনি আকাশ জুড়ে অভিমানী মেঘের দল ভিড় করেছে কেঁদে বুক ভাসাবে বলে।

আকাশ দেখছি, খোলা গেটের দিকে তাকাচ্ছি, গানও শুনছি, আর নিজের কথা ভাবছি। আমি আর দশটা মেয়ের মত নই, জন্মের পর থেকেই ভাগ্য আমার ওপর বিরূপ। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আমার তখন দু'বছর বয়েস। আমরা দু'ভাই বোন, কচি মানে জাহিদ আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট। আমাদের মা স্কুলে পড়াতেন, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছেন আমাদের। আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকার বছরই মা ক্যান্সারে মারা গেছেন। কচি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে পড়ে, ঢাকায়। দু'বছর পর পাস করে বেরুবে। টিউশনি করে সে তার নিজের খরচ চালায়। আমি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলা সাহিত্যে চলতি বছর এম. এ. পাস করেছি। রেজাল্ট বেরুলেও হোস্টেল ছেড়ে দিতে পারছি না। পিএইচডি করার ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব নয়, আমাকে চাকরি করতে হবে।

সুপারিশ করার লোক নেই, চাকরি পাওয়াও সহজ হবে না।
একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বাস্তবে ফিরে এলাম, দেখি কি স্কুলের লোহার গেট জুড়ে সাদা একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ির দরজা খুলে গেল, বৃষ্টির মধ্যে নেমে এলেন দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক। অদ্ভুতই লাগল ব্যাপারটা। ভদ্রলোক দামি সুট পরে আছেন, অথচ বৃষ্টিতে ভিজতে তাঁর যেন কোন আপত্তি নেই। গাড়ির দরজাটা বন্ধ করলেন এত জোরে, গেটটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ওমা, ভদ্রলোক দেখছি গেট দিয়ে স্কুলের ভেতর ঢুকছেন। আড়ষ্টবোধ করলাম। আশপাশে কদম আলিকে কোথাও দেখছি না, স্কুলের সামনের দিকে একা আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই বৃষ্টির মধ্যে, স্কুল ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো, কার কাছে আসতে পারেন উনি!

গেট পেরিয়ে হন হন করে হেঁটে আসছেন ভদ্রলোক, মনে হলো যেন খুব রেগে আছেন। উঠানের মাঝখানে চলে এসেছেন, কেন যেন তাঁকে আমার চেনা চেনা লাগল। কোনদিকে তাকাচ্ছেন না, সরাসরি বারান্দার ধাপগুলোর দিকে হেঁটে আসছেন। একহারা গড়ন, হাঁটার মধ্যে অভিজাত একটা ভাব ফুটে আছে। সাধারণ একটা নীল সুতী শাড়ি ও নীল ব্লাউজ পরে আছি আমি, কব্জিতে হাতঘড়িটা ছাড়া কোন অলঙ্কার নেই, আজ একটু ক্রীম বা লিপস্টিক মেখে আসার কথাও মনে ছিল না—স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করলাম। ভদ্রলোক বোধহয় এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেয়েছেন, সামান্য ঘুরে গিয়ে ধাপগুলোর দিকে না এগিয়ে, এগিয়ে আসছেন এবার সরাসরি আমারই দিকে। বৃষ্টির জন্যে ভাল করে দেখতে পাইনি, উনি আরও খানিকটা কাছে চলে আসার পর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার। একাধারে অবিশ্বাস, বিস্ময়, ভয়, শ্রদ্ধা ও অদ্ভুত এক পুলকে দিশেহারা বোধ করলাম আমি। মনে হলো, এ সত্যি নয়, সত্যি হতে পারে না—গান শুনতে শুনতে সম্মোহিত হয়ে পড়েছি, স্রেফ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি আমি।

'আপনি?' মার্জিত, ভরাট কণ্ঠস্বর, একটু যেন বেশি তীক্ষ্ণ, তবু এ-কণ্ঠস্বর আমার চেনা। 'এ স্কুলে পড়ান?'

নির্বাক বিস্ময়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম, মুখে কথা যোগাল না। কি করে বিশ্বাস করব, বৃষ্টি ঝরা নির্জন দুপুরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমারই প্রিয় গায়ক তারিক রহমান? সম্ভবত ওঁর প্রশ্নগুলো ভাল করে বুঝিনি, মাথাটা ঝাঁকালাম বোধহয় নিজের অজান্তেই।

'বাচ্চাদের কি পড়ান আপনারা, বাড়িতে জিজ্ঞেস করলে একটা পড়াও বলতে পারে না?' রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছেন, তবু ঝাঁঝটুকু চাপা থাকল না।

'কার কথা বলছেন…?' গলা শুকিয়ে গেছে আমার, আওয়াজ বেরুতে চায় না।

'আমার দুই ছেলেমেয়ে আপনাদের স্কুলে পড়ে। একজন কেজি ওয়ানে, আরেকজন নার্সারীতে। শক্তি ও বাণী। ছেলেটা বড়, সাত বছরের। মেয়েটা ছোট, পাঁচ বছরের…।'

শক্তি আর বাণী, দুজনকেই আমি চিনতে পারলাম। মেয়েটা খুবই মিষ্টি চেহারার, ছেলেটা একটু দুষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু ওরা যে তারিক রহমানের ছেলেমেয়ে, কেউ তো আমাকে বলেনি! হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, ভদ্রলোক বারান্দার নিচে উঠানে দাঁড়িয়ে ভিজছেন, কিন্তু সেদিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। নরম সুরে বললাম, 'ভিজছেন যে, বারান্দায় উঠে আসুন না!'

'ধন্যবাদ। ভিজে তো গেছিই, বারান্দায় উঠে আর লাভ কি। আমি জানতে চাই…।'

এই সুযোগ, ভাবলাম আমি, তারিক রহমানের একটা অটোগ্রাফ নিতে হবে। কিন্তু যা রেগে আছেন, অটোগ্রাফ চাই কিভাবে! দেখা যাক, ওঁর রাগ কমানো যায় কিনা। ইতিমধ্যে নিজেকে আমি সামলে নিতে শুরু করেছি। বললাম, 'আপনার যদি কোন অভিযোগ থাকে, হেড মিসট্রেসকে জানাতে হবে। কিন্তু উনি তো এখন নেই। আপনি ইচ্ছে করলে লিখিত অভিযোগ করতে পারেন। তবে, শক্তি ও বাণীর পড়াশোনা ভাল হচ্ছে না, এটা আমরা সবাই জানি। ভাল হবে কি করে, ওরা তো মাসের মধ্যে মাত্র পাঁচ-সাত দিন স্কুলে আসে...'

'সর্বনাশ! কি বলছেন!' রীতিমত আঁতকে উঠলেন তারিক রহমান।

শিল্পী মাত্রই কি উদাসীন, এমন কি আমার প্রিয় শিল্পীও? নিজের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ঠিকমত আসে না, এ-খবরও রাখার সময় পান না? উনি না হয় সময় পান না, কিন্তু ওঁর স্ত্রী? 'আপনি এভাবে ভিজছেন, আমার খুব খারাপ লাগছে। দয়া করে বারান্দায় উঠে আসুন। ইচ্ছে করলে ক্লাসরুমে বসতেও পারেন।'

তারিক রহমান লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠলেন, কিন্তু আমার দিকে তাকালেন না, খোলা দরজা দিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন সামনের একটা ক্লাসরুমে। ঘুরে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম আমি। দেখলাম, একটা বেঞ্চে বসে কপাল থেকে ভিজে চুল সরাচ্ছেন, চোখ বুলাচ্ছেন ক্লাসরুমের চারদিকে। আমার দিকে ওঁর কোন খেয়াল নেই। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলেও, নিজের কাছেও তা স্বীকার করতে লজ্জা পেলাম। মুহূর্তের জন্যে ভাবলাম, দেখতে কি আমি এতই খারাপ যে তাকানোর পর্যন্ত যোগ্য নই?

আমিই নিস্তব্ধতা ভাঙলাম, 'স্কুলে না হয় ঠিকমত আসে না, কিন্তু প্রাইভেট টিউটরের কাছেও কি রোজ পড়তে বসে না ওরা? আমি যতটুকু দেখেছি, মাথা তো ওদের একজনেরও খারাপ নয়...'

'প্রাইভেট টিউটর? একজনও টেকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন তারিক রহমান, যেন আমাকেই দায়ী করছেন। 'বড় জোর পনেরো দিন বা একমাস, তারপরই পালিয়ে যায়।'

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাই আমি।

'কেন তা আমিও জানি না। বেতন দেয় মেহের আপা, তাদের হয়তো পোষায় না। কিংবা হয়তো ভাল চাকরি পেয়ে চলে যায়। এমনও হতে পারে, আমার ছেলেমেয়েরা বেশি দুষ্ট, বাগে আনতে না পেরে কেটে পড়ে। কারণটা যা-ই হোক, পার্ট-টাইম টিউটর দিয়ে কাজ হবে না, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। ওদেরকে মানুষ করতে হলে ফুল-টাইম একজনকে দরকার আমার। আপনি তো পড়ানোর কাজেই আছেন, ভাল একজন প্রাইভেট টিউটর যোগাড় করে দিন না।'

মেয়েটা কি আমার চেয়েও বেশি ভক্ত ওঁর? সেই একই গান এবার নিয়ে চারবার শুনছে। এক সেকেণ্ডের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তারিক রহমানের ভরাট গলা শুনে হুঁশ হলো।

'ওদের মাথা বলছেন খারাপ নয়, তাহলে দায়িত্বটা আপনিই নিন না!' সরাসরি প্রস্তাব দিলেন তারিক রহমান। লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে ইচ্ছে করল আমার, কারণ আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। 'মেহের আপাকে এবার নাক গলাতে দিচ্ছি না, বেতনটা আমি ঠিক করব। তিন হাজার টাকা, থাকা-খাওয়া সব আমাদের ওখানে। তার আগে অবশ্য আমাকে জানতে হবে কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি, বাড়িতে কে কে

আছেন··· ।'

একের পর এক বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে আমার বোধবুদ্ধি লোপ পাবার অবস্থা হলো। আজকের বৃষ্টিটা বিশেষ একটা তাৎপর্য বহন করছে যেন···। নিজেও জানি না কখন বলতে শুরু করেছি, 'চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে এ-বছর পাস করেছি বাংলায়। এখনও আমি হোস্টেলে থাকি। ঢাকায় এক ভাই ছাড়া আর আমার কেউ নেই··· ।'

তারপর দেখি, বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এসেছেন উনি। গোটা ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের ভেতর ঘটছে। লম্বা, একহারা শরীর, আমার সামনে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর ভেজা কাপড়ের গন্ধ পাচ্ছি আমি। দূর থেকে ভেসে আসছে ওঁর গানের সুর ও কথা।

এমন তো কথা ছিল না
দূরে ঠেলে দেবেই যদি, ডাকলে কেন
প্রথম দেখায় অমন করে হাসলে কেন
এত ব্যথা আমি তো আর সইতে পারি না
এলেই যদি, যাবে কেন বুঝতে পারি না।

'নিন!' দ্বিতীয়বার তাগাদা দিলেন তারিক রহমান, তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম বলে প্রথমবার ওঁর কথা শুনতেই পাইনি। 'আমার কার্ড। মাসের আজ পঁচিশ তারিখ, এই ক'টা দিন বাদ দিয়ে পয়লা তারিখ সক্কাল বেলাই চলে আসুন। মেহের আপাকে আজই গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি আমি। ভাল কথা, আপনার নামটা তো জানা হয়নি! গান-টান জানেন, মানে চর্চা আছে?'

ভেজা একটা কার্ড, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিলাম আমি। 'আমি শিমুল···না, মানে···ওটা আমার ডাক নাম। আসল নাম··· ।'

আমাকে থামিয়ে দিলেন তারিক রহমান। 'ডাক নামেই চলবে। বাড়িতে আসুন, বাচ্চাদের পড়ান, দেখুন টিকতে পারেন কিনা··· ।' তারপর আমার দিকে একটু ঝুঁকলেন, বললেন, 'বাড়িটা চিনতে পারবেন তো? পাহাড়ের মাথায়, তবে ট্যাক্সি যায়, পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা।'

কার্ডের ওপর চোখ বুলালাম আমি। অত্যন্ত দামি, এমবস করা ভিজিটিং কার্ড। প্রথমে তারিক রহমানের নাম লেখা রয়েছে। নিচে লেখা, বিলাসভবন। তারপর লেখা, কুলসি। বাড়ির কোন নাম্বার নেই। তবে টেলিফোন নাম্বার আছে—দুটো।

তীক্ষ্ণ নজর ভদ্রলোকের, আমার চোখে দ্বিধা দেখেই মনের ভাব বুঝে ফেললেন, বললেন, 'বিলাসভবন বললেই দেখিয়ে দেবে সবাই। বললেন না তো, গান-টান করেন কিনা?'

'সামান্য,' বলেই বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসলাম, 'আপনি কি শুধু বিষাদের গানই লেখেন?'

হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। পরমুহূর্তে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলাম, আমি অপমান বোধ করতে পারি বলেই অত্যন্ত নরম সুরে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন তিনি, বললেন, 'যদি কোনদিন সুযোগ হয়, পরে একদিন আমার গান নিয়ে আলোচনা করা যাবে, কেমন? আজ আমি আসি। তাহলে সেই কথাই রইল, আপনি এক তারিখ থেকে আসছেন। যদি কিছু জানার থাকে, টেলিফোন করবেন—আমি না থাকলে শরাফত মিয়াকে চাইবেন,' বলে আর দাঁড়ালেন না, আমাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন

বারান্দায়, লাফ দিয়ে উঠানে নামলেন, বৃষ্টির মধ্যে হন হন করে হেঁটে গেলেন গেটের দিকে। গেটের কাছে পৌঁছে খেয়াল হলো, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'বৃষ্টির মধ্যে ফিরবেন কিভাবে? বলেন তো আপনাকে পৌঁছে দিই।'

'না, ধন্যবাদ, আমি নিজেই চলে যেতে পারব।'

তবু দাঁড়িয়ে থাকলেন ভদ্রলোক। ইতস্তত করছেন। হয়তো ভাবলেন, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা উচিত হবে কিনা। নতুন পরিচয়, আমি কি ভাবি না ভাবি। আমাকে আরও একবার খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন গেট দিয়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম, গাড়িতে উঠলেন ভদ্রলোক, আমার দিকে তাকালেন, তারপর স্টার্ট দিয়ে চলে গেলেন। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। এইমাত্র যা ঘটেছে, এখনও পুরোপুরি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। গাড়িটা চলে যাবার শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। ক্যানভাসের ব্যাগটা ভাল করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ওই বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে এলাম আমি। ভিজতে এখন ভালই লাগবে আমার।

বিলাসভবনে আমার চাকরি হওয়ায় লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার্সের টিচাররা সবাই ভারি খুশি, দু'একজনকে খানিকটা ঈর্ষান্বিতও মনে হয়েছে—তবে সেটা আমার বোঝার ভুলও হতে পারে। তাদের কাছ থেকেই কিছু তথ্য পেলাম। বিলাসভবন আসলে ভারতীয় কোন এক রাজা প্রায় একশো বছর আগে তৈরি করেছিলেন, গরমের দিনে এখানে ছুটি কাটাতে আসতেন রাজ-পরিবারের সদস্যরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও অনেক বছর খালি পড়ে ছিল ওটা, তারপর রাজ-পরিবারের কোন এক উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিয়েছেন তারিক রহমান। ইতিমধ্যে আরও জানতে পেরেছি, ভদ্রলোকের স্ত্রী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, বছর তিনেক আগে।

এক তারিখ বেলা এগারোটার দিকে একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলাম আমি। সাথে দুটো সুটকেস, আমার বলতে যা কিছু আছে সবই এ-দুটোয় ভরে নিয়েছি। পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরে ধীরগতিতে এগোচ্ছে ট্যাক্সি, বুঝতে পারছি একটু পরই বিলাসভবন দেখতে পাব। হঠাৎ একটা চিন্তা এল, খানিকটা লজ্জা ও বিব্রত বোধ করলাম। তারিক রহমানের প্রস্তাব পাবার পর একবারও আমি ভেবে দেখিনি, চাকরিটা আমার নেয়া উচিত হবে কিনা। প্রস্তাবটা পাবার পর এক সেকেণ্ডও ইতস্তত করিনি, বলা যায় লোভী ও নির্লজ্জের মত রাজি হয়ে গেছি। বিলাসভবনের পরিবেশ কেমন হবে, ওঁরা লোক কেমন, কিছুই জানি না অথচ দু'বছরের পুরানো চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। বোকামিই করলাম কিনা!

বাড়িটা দেখে উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এল আমার। অকারণ পুলক ও রোমাঞ্চে শিরশির করে উঠল শরীর। পাহাড়ের প্রায় পুরোটা মাথা জুড়ে বিলাসভবন আক্ষরিক অর্থেই একটা রাজবাড়ি। রাজবাড়ি, কিন্তু পুরানো নয়। বাড়ির সামনের অংশটা ভেঙে নতুন করে বানানো হয়েছে। রঙ করা নতুন লোহার গেট, খোলা রয়েছে, ভেতরে সবুজ লন দেখতে পেলাম। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল বেবী ট্যাক্সি। লনের একধারে বাগান, রঙবেরঙের কত ফুল ফুটে রয়েছে। বাগানের ভেতর কয়েকটা শ্বেত পাথরের তৈরি নগ্ন নারীমূর্তি, চোখ ফিরিয়ে নিতে হলো। বাড়ির সামনের অংশ লাল রঙ করা। গাড়ি বারান্দায় একটা গাড়ি রয়েছে, তবে সেদিনের দেখা সাদা টয়োটা নয় ওটা। ছোট একটা গাড়ি,

সম্ভবত সুবারু হবে। সদর দরজার কাছে থামল ট্যাক্সি।

নিচে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে ধাপ বেয়ে উঠছি, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা একটা কাচমোড়া দরজা খুলে গেল, শার্ট ও লুঙ্গি পরা প্রৌঢ় এক লোক বেরিয়ে এল বারান্দায়। ধারণা করলাম, তারিক রহমান এর কথাই বলেছিলেন আমাকে—শরাফত মিয়া। কিন্তু তার অবাক ভাব দেখে বুঝতে পারলাম, আমার আসার কথা তার জানা নেই। ধাপ বেয়ে উঠে তার সামনে দাঁড়ালাম আমি, নিজের পরিচয় দিলাম। প্রৌঢ় শরাফত মিয়া এতক্ষণে হাসল, তাড়াতাড়ি সুটকেস দুটো চেয়ে নিল আমার কাছ থেকে। এই সময় খোলা দরজা দিয়ে আরেকজন বেরিয়ে এলেন। এত বেলাতেও স্লিপিং গাউন পরে আছেন ভদ্রলোক, মাথার কাচাপাকা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। সরল চেহারা, হাসি হাসি মুখ। আমাকে দেখে তাঁর মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো। ভদ্রলোকের ভাষা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। বললেন, 'কে গো তুমি সুন্দরী? বিলাসভবনে কি উদ্দেশ্যে তোমার শুভাগমন?' হঠাৎ দাঁত দিয়ে জিভ কাটলেন। 'এই যাহ্, মিলল না!'

ভদ্রলোক আমার এত কাছে এসে দাঁড়ালেন যে এক পা পিছিয়ে যেতে হলো আমাকে। সাবধানে বললাম, 'আমি শিমুল···।'

'বাহ্, নামটি তো ভারি মিষ্টি—শিমুল। দেখেই বুঝেছি মনটি তোমার কোমল একটি ফুল!'

মুখ গরম হয়ে উঠল আমার। চেহারাটাও বোধহয় লালচে দেখাচ্ছে। এভাবে, সরাসরি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত নই আমি। কি বলব বুঝতে পারছি না। ভাবিনি বিলাসভবনে পা দিয়েই কোন পাগলের পাল্লায় পড়তে হবে আমাকে।

'ওহে শরাফত, হও তফাৎ।'

প্রৌঢ় শরাফত আমাকে অভয় দিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির ভেতর।

'পরিচয় ইত্যাদি এবার হওয়া দরকার,' ভদ্রলোক সুর করে বললেন। 'যদিও তুমি কার কে তোমার।' খুক করে একবার কেশে নিলেন তিনি। 'নামকাওয়াস্তে হলেও মহারানীর পতি আমি মোরশেদ খান, শুনতে যা-ই মনে হোক এর মধ্যে নেই কোন ভান।'

আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠে তাঁকে বললাম, তারিক রহমানের দুই ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে।

কথাগুলো ছন্দ মিলিয়ে বলার চেষ্টা করছেন ভদ্রলোক, যদিও তাতে যে তাঁকে ভাঁড় বলে মনে হলো তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রলোককে আমার ভালই লাগল। এখনও অবশ্য জানি না আসলে এ-বাড়ির সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। অদ্ভুত একটা সারল্য আছে ভদ্রলোকের চেহারা ও আচরণে। এরপর তিনি শরাফত মিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন দীর্ঘ অনেক বছর ধরে পরিবারটির সাথে আছে সে, পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। লোকটা একাই সাতজন মেয়ের কাজ করে। মেয়েগুলো মানে বাড়ির ঝি-চাকরানী, বুঝে নিলাম। মোরশেদ খানের ভাষায়, পরচর্চা ও কুৎসা রটনা, এই দুটো কাজ ছাড়া আর কিছু তারা করে না। শক্তি আর বাণীর প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, আকলিমা চাচী চলে যাবার পর ওদের ওপর নজর দেয়া হচ্ছে না, সেজন্যেই ওরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হাসি চেপে আমি তাঁকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি সব সময় ছন্দ মিলিয়ে কথা বলেন?'

'না রে ভাই, ওদের ডরাই!' রীতিমত আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'মনের মত মানুষ যদি পাই, সুর সাগরে ভাসতে আমি চাই।' তারপর জানালেন, তারিক রহমানের একমাত্র ভগ্নীপতি তিনি। এ-বাড়িতেই সস্ত্রীক আছেন।

পরে আমি জানতে পেরেছি তাঁর করুণ ইতিহাস। বছর সাতেক আগে, আত্মহত্যা করার জন্যে বিষ খেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেই থেকেই মাথায় সামান্য ছিট দেখা দেয়।

এরপর তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলেন। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই আবার আমার দম বন্ধ হয়ে এল উত্তেজনায়। কোন ঘর এভাবে সাজানো যেতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। এত বড় কামরাও আগে কখনও দেখিনি আমি। তিন কোণে তিন সেট বিশাল আকৃতির সোফা ফেলার পরও প্রচুর জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। আমার স্যাণ্ডেল সহ গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল উজ্জ্বল নকশা কাটা কার্পেটে। সব মিলিয়ে পাঁচটা ঝাড়বাতি সিলিং থেকে ঝুলছে। এক কোণে একটা ট্রলির ওপর রঙিন টিভি, স্ক্রীনটা চল্লিশ ইঞ্চির কম নয়। তিন দিকের দেয়াল ভারি মখমল দিয়ে ঢাকা, শুধু একদিকের দেয়ালে একটা পোর্ট্রেইট ঝুলছে। মেয়েটা এত সুন্দরী, চোখ ফেরাতে পারলাম না।

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মোরশেদ খান, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ছবিটার দিকে তাকালেন তিনিও। তারপর ব্যাখ্যা করলেন, তার শ্যালকের স্ত্রী শারমিন সুলতানা এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। গাড়িটা তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন, চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি যাবার পথে।

তখনও আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি ছবিটার দিকে। এত সুন্দর ছবি জীবনে আমি দেখিনি। ভাবছি, শারমিন সুলতানা সত্যিই কি এরকম দেখতে ছিলেন, নাকি শিল্পীর আঁকার গুণে এতটা সুন্দর হয়ে উঠেছেন?

'উনি কি বাড়িতে আছেন··· মানে, তারিক রহমান?' জানতে চাইলাম আমি।

মোরশেদ খান জানালেন, তারিক রহমান ঢাকায় গেছেন, তবে আজই ওঁর ফেরার কথা। তারপর বললেন, অস্বস্তি দূর করার জন্যে খুক করে একবার কেশে নিয়ে, তাঁর স্ত্রীকে পঙ্গুই বলা যায়, হুইলচেয়ারে বসে চলাফেরা করেন। পঙ্গুত্বের কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন। অদ্ভুত ধরনের একটা বাত চল্লিশ পেরুবার আগেই তাঁকে অচল করে রেখেছে, তিনি হাঁটতে পারেন না। সেজন্যেই তো এই বিশাল রাজবাড়িটা কিনেছেন তাঁর শ্যালক, হুইলচেয়ারে বসে ওঁর বোন যাতে ঘুরে বেড়াতে পারেন।

'সবাই তাকে মান্য করে, যেন মহারানী,' বললেন মোরশেদ খান। 'চাকর-বাকর তারই ফরে, ভারি শক্ত ঘানি।'

সাদা শাড়ি পরা এক তরুণী ঢুকল স্টাডিরুমে, আমাকে বলল, 'আপা, বেগম সাহেবা আপনার আসার কথা শুনেছেন। উনি আপনাকে দেখতে চান।'

হুইলচেয়ার আর হুইলচেয়ারে বসা মানুষটি, দুটোই দেখার বস্তু। রূপালি চেয়ারটা চকচক করছে, অত্যন্ত দামি জিনিস। আর ওটায় যিনি বসে আছেন, তাঁর রূপের কোন তুলনা হয় না। চেয়ারে বসে থাকলেও বোঝা গেল, যেমন লম্বা ভদ্রমহিলা তেমনি চওড়া। দুধে-আলতা গায়ের রঙ, অভিজাত চেহারা, নাকটা টিয়াপাখির মতই খাড়া। সব মিলিয়ে, শ্রদ্ধা এসে যায়। তবে দুটো জিনিস চোখে বাঁধল। এক, মোরশেদ খানের তুলনায় তাঁর বয়স একটু বেশি বলে মনে হলো। ওঁর যদি চল্লিশ হয়, মোরশেদ খান পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। দুই, প্রয়োজন নেই তবু অত্যধিক মেকআপ ব্যবহার করেছেন ভদ্রমহিলা।

ঠোঁটের টকটকে লাল লিপস্টিক রীতিমত দৃষ্টিকটু বলা যায়। সুতীই, তবে অত্যন্ত দামি শাড়ি পরে আছেন তিনি, কাঁধটা ভাঁজ করা একটা সিল্কের চাদরে ঢাকা। প্রথমে তিনি হাসলেন না, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালেন। তারপর নরম সুরে বললেন, 'তোমাকে আমি তুমিই বলব, কিছু মনে কোরো না।' আরেকবার আমার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসলেন মিষ্টি করে।

মৃদু হেসে উত্তর দিলাম, 'তুমিই তো বলবেন, আমি আপনার ছোট বোনের মত।'

'ভারি খুশি হলাম। দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব শান্ত মেয়ে। বোসো ভাই,' আদর করে তিনি আমাকে বসতে বললেন, হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন কাঠের একটা চেয়ার। 'এসো, তোমার সাথে গল্প করি।'

গল্প শুরু হবার পর বোঝা গেল, মেহের আপা সহজ মানুষ নন। রীতিমত জেরা শুরু করলেন তিনি। আমার বয়স কত, এত বয়েসেও বিয়ে হয়নি কেন, কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবছি কিনা, কাগজ-পত্র দেখিয়ে প্রমাণ করতে পারব তো ইউনিভার্সিটির শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠেছি, এ-ধরনের ষাট-সত্তরটা প্রশ্ন করার পর জানতে চাইলেন, 'তোমার মা-বাবা কে কি করেন?'

'ওঁরা কেউ বেঁচে নেই,' শান্তভাবে বললাম।

'তারমানে তোমার কোন বাঁধন নেই? যা খুশি তাই করতে পারো, কিছু বলার কেউ নেই?'

'শুধু এক ভাই আছে।'

'আপন ভাই, নাকি পাতানো?'

'আপন।' ভাবলাম, এ আবার কেমন প্রশ্ন।

'ছোট, না বড়?'

'ছোট।'

'আজকাল তো শুনি ছোট ভাইরা বড় বোনদের রোজগারে চলে, এ-ও বোধহয় তাই?'

'আমার ভাই পড়াশোনা করে, নিজের খরচ তো চালায়ই, প্রয়োজনে আমাকেও সাহায্য করে,' একটু কঠিন সুরেই বললাম আমি।

'ভাইয়ের হয়ে তো বলবেই তুমি, আসল ঘটনা কে দেখতে যাচ্ছে।'

বিস্ময়ে ও রাগে কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে থাকলাম।

'কিছু মনে কোরো না, শুনে মনে হচ্ছে তোমরা গরীব পরিবারের ছেলেমেয়ে। গরীবরাও ভাল হয়, তবে একটু লোভী হওয়াই স্বাভাবিক। এ-সব কথা বলার কারণ হলো, এ-বাড়িতে অমন হাজারটা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে, কোনটাই কম দামি নয়। আমি আসলে বলতে চাইছি, সব দেখেশুনে রাখবে আর কি, ব্যবহারও করবে, তবে নিজের মনে করে ভাইকে দিয়ে পাচার কোরো না।'

'ছি-ছি, এসব আপনি কি বলছেন!' মাথাটা আমার ঘুরতে শুরু করেছে। কথাগুলো কি সত্যি আমাকে বলা হচ্ছে, নাকি আমি কল্পনা করছি?

'যাদের সংস্পর্শে আসি, তাদের সবার ভাল চাই আমি, সেজন্যেই আগে থাকতে সাবধান করা,' মিষ্টি হেসে বললেন মেহের আপা। 'সত্যি করে বলো তো, এরকম একটা অভিজাত পরিবারে ঢোকার সুযোগ পেয়ে নিজেকে তোমার ভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে না?

কত বেতন দেয়ার কথা বলা হয়েছে তোমাকে?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলাম, চেষ্টা করছি চোখে যেন পানি বেরিয়ে না আসে। একটা ঢোক গিলে বললাম, 'তিন হাজার।'

'খাওয়াদাওয়ার জন্যে কত কাটা হবে?'

'থাকা-খাওয়ার জন্যে আলাদা টাকা দিতে হবে, এ-কথা আমাকে বলা হয়নি।'

'বেতন পাবে দেড় হাজার, যদি আমাদের এখানে থাকো ও খাও,' বললেন মেহের আপা। 'আর যদি বাইরে খাও ও অন্য কোথাও থাকো, পাবে আড়াই হাজার।'

প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মেহের আপা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'দেখতে তুমি খারাপ নও, বেশ সুন্দরীই বলতে হবে। এত চাকরি থাকতে বাচ্চাদের পড়ানোর চাকরি তোমার পছন্দ হলো কেন? এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তো?'

'অন্য কোন উদ্দেশ্য? মানে?'

এবারও আমার প্রশ্নের প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না মেহের আপা, জানতে চাইলেন, 'তোমার ভাইটি থাকে কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'ভালই হলো, ঘন ঘন আসতে পারবে না। ঠিক বলছ, কারও সাথে বিয়ের কথা চলছে না তোমার? কিংবা কাউকে ভালও বাস না?'

'না।'

'তাহলে শোনো,' হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলেন মেহের আপা। 'এখানে আসার পিছনে তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় বর বাগানো, সময় থাকতে সে-কথা মন থেকে মুছে ফেলো। এখানে পুরুষমানুষ যে-ক'জন আছে, তাদের মধ্যে বিয়ের উপযুক্ত একজনও নয়। আমাদের এখানে তোমার উপযুক্ত পাত্র কেউই নেই, আসা-যাওয়াও করে না।'

'সন্দেহ নেই, আপনি আমার ভালর জন্যেই এত সব কথা বলছেন,' এবার আমিও মিষ্টি হেসে উত্তর দিলাম। 'সেজন্যে সত্যি আমি কৃতজ্ঞবোধ করছি। কৃতজ্ঞবোধ করছি আর আপনার প্রতি সহানুভূতি বোধ করছি।'

হাসতে গিয়েও হাসলেন না মেহের আপা। ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন তিনি, চোখে সন্দেহ। 'সহানুভূতি বোধ করছ? কেন?'

'আপনি যেসব কথা বলছেন, ওগুলো শুধু ছোটলোকদের মুখে মানায়,' ঠোঁটে মিষ্টি হাসিটা ধরে রেখেই বললাম আমি। 'আমার ভালর জন্যে বাধ্য হয়ে ছোটলোকদের ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে আপনাকে। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার।' পরমুহূর্তে বিনয়ে বিগলিত হবার ভান করলাম। 'বিশ্বাস করুন, মেহের আপা, অসৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আমি আসিনি। বাচ্চাদের ভালবাসি, সেজন্যেই চাকরিটা আমার পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া, আপনার ভাই বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন···।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বললেন মেহের আপা। 'শুনে খুশি হলাম।' কিন্তু লক্ষ করলাম, ভুরু জোড়া এখনও কুঁচকে আছে তাঁর। আমার ব্যাপারে বেশ চিন্তিত বলে মনে হলো তাঁকে। 'আর মাত্র একটা প্রশ্ন। তুমি কি গান পছন্দ করো?'

'গান কে না পছন্দ করে।'

'না, বলতে চাইছি চর্চা করো কিনা।'

'সামান্য।'

'হারমোনিয়াম বাজাতে পারো? পিয়ানো?'

'হারমোনিয়াম পারি। পিয়ানো শিখিনি, তবে দেখিয়ে দিলে পারব।'

'পারতে হবে না,' মেহের আপা চোখ রাঙালেন। 'রেওয়াজ করার আলাদা একটা কামরা আছে আমার ভাইয়ের। সেখানে যন্ত্রপাতি যা আছে, সবই তার একার ব্যবহারের জন্যে, আর কারও সেখানে ঢোকার অনুমতি নেই। কিন্তু কথা সেটা নয়, কথা হলো, এ-বাড়িতে গান শুধু একজনই গাইবে, আমার ভাই। আর কারও গলা যেন কানে না আসে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

'কিন্তু,' বললাম, 'আপনার ভাই যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি গান-টান করি কিনা। আমার ধারণা, উনি চান শক্তি আর বাণীকে এক-আধটু গানও শেখাব আমি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মেহের আপা বললেন, 'ওরা আবার কি গান শিখবে! ওদের গলা বলে কিছু আছে?'

'কিন্তু আপনার ভাই যদি চান···।'

'ঠিক আছে, তারিক যখন থাকবে না তখন ওদেরকে নিয়ে যত ইচ্ছা ছাগলের মত ব্যাঁ ব্যাঁ কোরো, আমি আপত্তি করব না। আসলে বলতে চাইছিলাম, নিজের আনন্দের জন্যে এখানে কিছু বাজানো বা গলা সাধা চলবে না।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলাম আমি।

'তোমার কাজের কথায় আসি এবার। তোমার আসল কাজ, বাচ্চা দুটোকে শান্ত রাখা। আর যতটা পারা যায়, আমার ভাইয়ের কাছ থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা। তারিক এ-বাড়িতে খুব কম আসে, ঢাকায় ব্যবসা দেখাশোনা করতে হয় ওকে। তার ওপর গান তো আছেই। যখন আসে, অত্যন্ত ক্লান্ত থাকে সে। আমি চাই না বাচ্চারা তাকে বিরক্ত করুক। তারিক যখন বাড়িতে থাকবে, তুমি আমাদের সাথে ডাইনিংরুমে খাবে না। ওদের পড়ার ঘরে তোমার খাবার পাঠিয়ে দেয়া হবে। মাঝে মধ্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরাও আসে, তখনও তুমি ডাইনিংরুমে আমাদের সাথে খাবে না। ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালাম। মনে মনে বললাম, তুমি যে শক্ত ঘানি তা ইতিমধ্যেই তোমার স্বামী আমাকে জানিয়েছেন।

'তারমানে, বোঝা গেল, আমাদের এখানেই খাবে তুমি। থাকবেও কি?'

'আপনার ভাই আমাকে এখানেই থাকতে ও খেতে বলেছেন।'

'বেশ। কিন্তু সেক্ষেত্রে বেতন পাবে দেড় হাজার···।'

'এ-বিষয়ে আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে আপনাকে,' বললাম আমি। 'কারণ আমাকে তিন হাজার টাকা দেয়ার কথা বলেছেন উনি।'

'ও কি বলেছে না বলেছে তাতে কিছুই আসে যায় না,' চোখ গরম করে বললেন মেহের আপা। 'এ-বাড়ির ভাল-মন্দ সব আমি দেখি। খরচপাতি সব আমার হাত দিয়ে হয়। বাজারদর, সংসার-ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তারিকের কোন বাস্তব ধারণা নেই। আমি যা ঠিক করব তাই হবে।'

'কিন্তু···।'

'আর হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলে তুমি ওকে বলবে, তিন হাজারই পাচ্ছ। মনে থাকবে তো?'

'মিথ্যে কথা বলব? কেন?'

'প্রথমদিন এসেই তুমি আমার সাথে তর্ক করতে চাও নাকি?' হুইলচেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন মেহের আপা। 'এখনও তুমি বোঝনি, এ-বাড়িতে আমি যা বলি সেটাই আইন? কেন বা কি, এ-ধরনের প্রশ্ন আমি শুনতে চাই না। আর, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে যে-সব কথা হচ্ছে বা হবে, তার একটা শব্দও যেন আমার ভাইয়ের কানে না যায়। তারিক বাড়িতে এলে তুমি তার সামনেই যাবে না। মনে থাকবে তো?'

ভীষণ একটা জেদ চেপে যাচ্ছে আমার। কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তে বিলাসভবন থেকে বেরিয়ে যেতে পারি আমি। কিন্তু সেটা হবে একটা অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করা। জেদ চাপল, এর আমি শেষটুকু দেখতে চাই। রাগের মাথায় কিছু না করে চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করা দরকার। বুঝলাম, এখানে টিকে থাকতে হলে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে আমাকে। মাথা গরম করা চলবে না। 'জ্বী, থাকবে,' নরম সুরে বললাম আমি। 'আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

আমাকে আত্মসমর্পণ করতে দেখে মিষ্টি করে হাসলেন মেহের আপা। 'জানতাম, চাকরিটা তোমার একান্ত দরকার, আমার সব শর্ত তুমি মেনে নিতে বাধ্য হবে। খুশি হলাম। আরেকটা কথা, মিষ্টি মিষ্টি হেসে আমাকে খোঁচা মারার চেষ্টা যা করার করেছ, আর কখনও কোরো না। প্রথমবার বলে তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম। মনে থাকবে তো?'

মাথা ঝাঁকালাম।

এরপর মেহের আপা কাজের লোকদের সম্পর্কে একটা ফিরিস্তি দিলেন। যে মেয়েটা আমাকে ডেকে আনল তার নাম সামিনা, তাঁর খাস চাকরানী। আরও একটা মেয়ে আছে, দিন-রাত থাকে, তার নাম লতা; লতার কাজ বাচ্চাদের দেখাশোনা করা। 'লতার সাথে এখন তুমিও এ-কাজে হাত লাগালে,' বলার ধরনটা যেন, লতার মত আমি আরেকজন চাকরানী। একজন বাবুর্চি আছে, করিম মিয়া। আর জব্বার হলো তারিক রহমানের খাস চাকর। ঠিকে কাজ করে যায় এমন চাকরানী আছে আরও দুজন। আর আছে ড্রাইভার, মালি ও শরাফত মিয়া। শরাফত মিয়া গোটা বাড়ি দেখাশোনা করে, তার নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই।

এত বড় বাড়ি, এত চাকরবাকর, রোমাঞ্চকর অনুভূতিটা আবার ফিরে এল আমার মধ্যে। রাগ করে চলে যাইনি, সেজন্যে খুশি হয়ে উঠলাম নিজের ওপর। লোভ নয়, অদ্ভুত একটা কৌতূহল জাগল আমার মনে। দারিদ্রক্লিষ্ট পরিবেশে মানুষ হয়েছি, অভিজাত ধনী পরিবার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। বিলাসিতা কাকে বলে জানি না। আর কিছু না হোক, অচেনা একটা জগৎকে দেখার সুযোগ তো পাব।

এরপর শারমিন সুলতানার প্রসঙ্গ তুললেন মেহের আপা। বললেন, 'তার কথা আমরা বাচ্চাদের শোনাই না। মরেছে, ফুরিয়ে গেছে—যদিও মৃত্যুটা দুঃখজনক। বাচ্চাদেরকে তার কথা মনে করিয়ে দেয়া হোক, আমার ভাই তা পছন্দ করে না।'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলাম আবারও। 'কিন্তু ওদের মায়ের কথা ওরা জানবে না?'

মেহের আপা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ওরা জানে না ওদের মা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ওদের ধারণা, তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এ-বাড়িতে শারমিন সুলতানার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা যাবে না।'

'ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বললাম।

ঘরে ঢুকলেন মোরশেদ খান। হুইলচেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। হাত

কচলে বললেন, 'তুমি আবার মাথা গরম করছ না তো, মেহের? ডাক্তার তোমাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছে। ক্লান্ত লাগলে বলো, সামিনাকে ডেকে বিছানায় শুইয়ে দিতে বলি।'

'তুমি আবার এখানে কি করতে এসেছ? যাও, তোমার কাজ তুমি করো, ছবি আঁকো!' ধমক দিলেন মেহের আপা।

'না, মানে, অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলছ তো, তাই···।'

'তুমি জানো, সহজে আমি ক্লান্ত হই না। আর আমি কথা বলব না তো কে বলবে? এত বড় সংসার, আমি না দেখলে সব ছারখার হয়ে যাবে না!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, তা তো ঠিকই।

'শিমুল নতুন মানুষ, ওকে সব বুঝিয়ে দিলাম। দেখো তো, শক্তি আর বাণী কোথায় আছে। ওদেরকে খুঁজে নিয়ে এসো এখানে।'

'আনছি, এখুনি আনছি।' তাড়াতাড়ি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মোরশেদ খান।

'উনি বুঝি ছবি আঁকেন?'

মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন মেহের আপা। 'ওটা একটা ছাগল, ওর কথা থাক।'

শুনে বোবা বনে গেলাম আমি। চুপ করে বসে আছি। লক্ষ করলাম, আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছেন মেহের আপা। অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলো কাটতে চাইছে না। অবশ্য একটু পরই বাচ্চাদের নিয়ে কামরায় ফিরে এলেন মেহের আপার স্বামী।

পাঁচ বছরের বাণী জাপানী পুতুলের মত দেখতে। তার ভেতর আড়ষ্ট ও দ্বিধার কোন ভাব নেই। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই চিনতে পারল সে, কচিকণ্ঠে হেসে উঠল, ছোট ছোট পায়ে ছুটে এসে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠে বসল আমার কোলে। 'মেডাম, স্লামালেকুম!' ঠোঁট টিপে হাসছে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

এত ভাল লাগল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, মুখ নামিয়ে চুমো খেলাম।

শান্ত, সাবধানী পায়ে এগিয়ে এল শক্তি। তার উচ্চারণে কোন ত্রুটি নেই, 'স্লামালেকুম, ম্যাডাম।' স্কুলে শেখানো আদব-কায়দা ভোলেনি সে। তবে হাসছে না, পরিস্থিতিটা প্রথমে বুঝে নিতে চায়। সাত বছর বয়েস শক্তির, বয়েসের তুলনায় বেশ লম্বাই সে। আঁটসাঁট সাদা হাফপ্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে আছে, সদ্য ইস্ত্রি করা। তার চুল ছোট করে ছাঁটা, মাঝখানে সিঁথি। মুখের চেহারা ঠিক গম্ভীর নয়, তবে সতর্ক ভাবটুকু বয়েসের তুলনায় বেমানান। বাবা বা মা, কারও চেহারাই পায়নি সে। তাকে আমার একটু জেদি বলেই মনে হলো, সামলানো কঠিন হতে পারে। মেয়েটা রোগা, হাসিখুশি, তবে চোখ দুটো বিষণ্ন।

আমার দিকে নয়, সরাসরি ফুফুর দিকে এগোল শক্তি। হুইল-চেয়ারের পাদানিতে পা রেখে উঁচু হলো, চুমো খেল ফুফুর মুখে।

'বেঁচে থাকো, সোনামণি।' ভাইপোর মাথায় বারবার চুমো খেলেন মেহের আপা। তারপর তিনি রক্তচক্ষু মেলে বাণীর দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে। 'এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা চাকরবাকর বা অনাত্মীয় কাউকে চুমো খাবে না, তাদের কারও চুমো নেবেও না। এই আইন খুব কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়। তুমি জানতে না, তাই এবারকার মত

দোষ ধরছি না। নামিয়ে দাও, কোল থেকে নামিয়ে দাও পাজিটাকে। আদব-কায়দা সব ভুলে গেছে দেখছি।'

আমি কি নামাব, ভয় পেয়ে নিজেই আমার কোল থেকে নেমে গেল বাণী।

'আমাদের টিউটর কেন দরকার, ফুফু-আম্মা?' আমার দিকে সতর্ক চোখ রেখে জানতে চাইল শক্তি। 'তুমি না সেদিন বলছিলে এ-বাড়িতে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না, তাতে শুধু ঝামেলা বাড়ে?'

'এভাবে কথা বলে না, মানিক,' চাপা কণ্ঠে বললেন মেহের আপা। ধমক নয়, আদর মাখা স্নেহের সুরে। 'বড়দের সামনে এভাবে কথা বলা উচিত নয়। ঝামেলা যদিও বাড়েও, ক'টা দিন মেনে নিতে হবে, সোনা। তোমার বাবার খেয়াল···দেখা যাক ক'দিন থাকে।'

এবার বাণীর দিকে তাকালেন তিনি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে মুখের ভেতর আঙুল পুরে চুষছে সে। বাচ্চাদের হাবভাব আমি বুঝি, বেচারি যে নার্ভাস হয়ে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'এই পাজি মেয়ে, আমাকে যে তুমি চুমো খেলে না?'

চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল বাণী। 'তুমি পচা, তোমাকে আমি চুমো খাই না।'

'ফের কালকের মত শুরু করেছ?' নরম সুরে বললেন মেহের আপা। 'এরই মধ্যে শাস্তিটার কথা ভুলে গেছ নাকি?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বাণীর চেহারা। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তাকে দেখে আমার ধারণা হয়েছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো যাবে না। মন না চাইলে কাউকে আদর বা খুশি করা তার স্বভাব নয়। ভাইয়ের ঠিক উল্টো স্বভাব।

'দিনে দিনে অবাধ্য হচ্ছ তুমি,' মেহের আপা নরম সুরেই কথা বলছেন। 'কাল তোমাকে কি বললাম আমি? রোজ সকালে দেখা হলে আর রাতে শুতে যাবার সময় তুমিও আমাকে শক্তির মত আদর করে চুমো খাবে। আজও যদি তুমি বেয়াদবি করো, সুইমিং পুলে গোসল করতে পারবে না। তার বদলে শিমুল আন্টি তোমাকে বিশটা অঙ্ক করতে দেবেন।'

বাণীর চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি তার একটা হাত ধরলাম আমি।

মেহের আপার গলা চাবুকের মত সপাং করে উঠল। 'খবরদার, শিমুল! একটুও আদর করবে না তুমি ওকে। ওটা একটা এক নাম্বার শয়তান। ওর বাপই ওকে নষ্ট করছে। বাড়িতে এলে মাথায় তুলে নাচে। বোঝে না, বাচ্চাদের কঠিন শাসনে না রাখলে পরে আর সামলানো যাবে না। মেয়েছেলের এত কিসের জিদ! ওর মুখেও কোন লাইসেন্স নেই। এরইমধ্যে তর্ক করতে শিখেছে। আর মিথ্যে কথায় তো ডুবে আছে বললেই হয়।'

ফোঁপাতে শুরু করল ছোট্ট বাণী, মুখটা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ভাবলাম, তারিক রহমান কি জানেন ওঁর ছেলেমেয়েদের সাথে কি রকম আচরণ করা হয়? ভাইঝিকে মেহের আপা সহ্য করতে পারেন না, এতে কোন সন্দেহ নেই।

দেয়ালের একটা বোতামে চাপ দিলেন মেহের আপা। প্রায় সাথে সাথে কামরায় ঢুকল তাঁর খাস চাকরানী সামিনা। সামিনাকে বলা হলো, আমাকে যেন বাচ্চাদের মহলে নিয়ে যাওয়া হয়। 'কাপড় পাল্টে তুমি হাত-মুখ ধোও, শিমুল,' বললেন মেহের আপা। 'তারপর ওদেরকে নিয়ে বাড়ির চারদিকে একটু হেঁটে এসো। কিন্তু আমার হুকুম যেন মেনে চলা হয়—বাণী আজ সুইমিং পুলে গোসল করতে পারবে না। লাঞ্চের আগে শুধু শক্তিকে নিয়ে সুইমিং পুলে যাবে তুমি, ও যদি সাঁতার শিখতে চায়।'

হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'মেহের আপা, আজকের মত ওকে মাফ করে দেয়া যায় না? ওকে আমি বোঝাব, দেখবেন কাল সকালে ঠিক আপনাকে আদর করবে।'

'দেখো শিমুল, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যেয়ো না। আমার হুকুম কখনও বদলায় না।'

বোবা বনে গেলাম। খিক খিক করে হেসে উঠল বাচ্চা ছেলেটা।

সাথে সাথে মিষ্টি হাসি ফিরে এল মেহের আপার মুখে, সস্নেহে বললেন, 'এর মধ্যে হাসির কিছু নেই, সোনা। হাসলে তোমার শিমুল আন্টিকে অপমান করা হয়। এবার বেরোও সবাই।' আমার দিকে তাকালেন। 'লাঞ্চের সময় আবার তোমার সাথে দেখা হবে আমার। কেউ বেয়াদবি করলে আমাকে জানাবে। আশা করছি বিলাসভবনে আমাদের সাথে ভালই থাকবে তুমি।'

ভাল থাকব? কি করে ভাল থাকব? আর কোন বিষয়ে যদি না-ও লাগে, বাচ্চাদের নিয়ে তো অবশ্যই তাঁর সাথে লাগবে আমার। বাণীকে কাছে টেনে আদর করার তীব্র ইচ্ছে জাগল, এখনও ফোঁপাচ্ছে সে। নিজেকে অনেক কষ্টে দমন করলাম। তার একটা হাত ধরে বেরিয়ে এলাম সামিনার পিছু পিছু। বিলাসভবনের চারপাশটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি আমরা।

একটু পরই তার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমার হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে। শান্ত চেহারায় খুশি খুশি ভাবটা ফিরে আসছে। শক্তিকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও সে আমার হাত ধরল না, এমন কি পাশেও এল না। সারাক্ষণ পিছিয়ে থাকল সে, দূর থেকে লক্ষ করছে আমাকে। বুঝতে পারলাম, শক্তিকে মানুষ করতে বেগ পেতে হবে আমাকে, বেশিরভাগ সময় তার পিছনেই ব্যয় করতে হবে। এই বয়েসেই অত্যন্ত চালাক হয়ে উঠেছে সে, মেহের আপার প্রভাব তার ওপর অত্যন্ত বেশি। অন্যায় প্রশ্রয় পেয়ে বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

বাড়ির বাইরে থেকে ফিরে এসেছি, সামিনা আমাদেরকে আমার ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই সময় ভরাট একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'শক্তি! বাণী!'

ঝট করে ঘুরল ওরা। ঘুরলাম আমিও। আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে সামান্য পুলক অনুভব করলাম দীর্ঘদেহী তারিক রহমানকে দেখে। হলঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক, হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে পিছনে রয়েছে শরাফত মিয়া। দোরগোড়া থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। আগেও একবার দেখেছি, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে ওঁর এই পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের ভাবটুকু আমার চোখে এভাবে ধরা পড়েনি। এমন সুদর্শন পুরুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি। আমার শরীরে একটা রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ছে, অনুভব করে ভীষণ লজ্জা পেলাম, কেউ জেনে ফেলবে এই ভয়ে তিরস্কারও করলাম নিজেকে। সেই মুহূর্তে আমার শরীরে একটা কাঁপুনি এসে গেল, বুঝতে পারলাম বিরাট একটা সমস্যায় পড়তে যাচ্ছি আমি। ওঁর সামনে এলেই যদি এরকম অবস্থা হয় আমার, তাহলে তো বিপদের কথা। একি যন্ত্রণায় পড়া গেল, নিজের ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না কেন!

সামনে থেকে তো একবার দেখেছিই, ওঁর অনেক ছবিও দেখেছি আমি। কিন্তু আজ মনে হলো, সে-সব দেখায় ত্রুটি ছিল বিস্তর। ছবিগুলো ওঁর চেহারার ওপর সুবিচার করেনি। তারিক রহমান শুধু লম্বা ও একহারা নন, নারীজাতির আদর্শ স্বপ্ন পুরুষ হবার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ওঁর চেহারায় রয়েছে। উন্নত ললাট, মায়াভরা চোখ, নিখুঁত কামানো ফর্সা

চামড়ার ওপর ক্ষীণ সবুজ একটা ভাব, খাড়া নাক, সরু ঠোঁট, চওড়া চোয়াল, ঘন কালো ভুরু···এমন চেহারার দিকে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকলে কেউ দোষ দিলে দিক— নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারব না, কাজেই সে চেষ্টা করছি না। একটা সাপ্তাহিকীতে দু'দিন আগেই পড়েছি, ওঁর বয়স বত্রিশ। কিন্তু দেখে কে বলবে ওঁর বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা আছে দুটো? মনে হবে, খুব বেশি হলে পঁচিশ বছর বয়েস। ছাই রঙের স্যুট পরে আছেন, সাদা ও চকলেট রঙের টাই, দারুণ মানিয়েছে।

বাচ্চারা ওঁর দিকে ছুটে গেল। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। ঝুঁকে দুই বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরলেন উনি। তারপর সিধে হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন।

'কখন এসেছেন আপনি, শিমুল?'

'এই তো।'

'দু'জনে তাহলে একই সময়ে পৌঁচেছি!' হেসে উঠলেন তারিক রহমান। 'সেদিন তাড়াহুড়ো করে প্রস্তাবটা দিলাম, তাই একটু সন্দেহ ছিল আপনি আসবেন কিনা। এসেছেন, সেজন্যে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। এবার যদি আমার শয়তান দুটো কিছু শেখে।'

'আমি শয়তান নই, শিমুল আন্টিকে দেখেই সালাম দিয়েছি,' কথা বলে উঠল বাণী, বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাসছে। 'আব্বু, আমাকে তুমি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে দেবে না?'

'কেন দেব না! পিয়ানোয় বসার আগে তিন ঘণ্টা আমার কোন কাজ নেই, এই তিন ঘণ্টা তোমাদের।' আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'জানেন, ওদের পিছনে প্রায় কোন সময়ই আমি দিতে পারি না।'

এবার কথা বলে উঠল শক্তি, 'কিন্তু আব্বু, ফুফু-আম্মা বাণীকে সুইমিং পুলে নামতে নিষেধ করেছে যে! বেয়াদবি করেছিল, তাই ওকে বিশটা অঙ্ক করতে হবে।'

ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে শক্তির মুখে হাতচাপা দিই। হলঘর থেকে আনা চিঠিগুলো বাছাই করছেন তারিক রহমান, বললেন, 'এ-সব কি শুনছি, মা-মণি? মেহের ফুফু যা বলবে শুনতে হবে তো।' বাণীর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠছে, কিন্তু তা তিনি দেখতে পাননি, আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'মেহের আপা, আমার একমাত্র বোন। বেচারি বাতে পঙ্গু হয়ে আছে, কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। ও না থাকলে কি যে করতাম, জানি না। বাড়ির সমস্ত দিক ও-ই তো সামলে রেখেছে, আমাকে কিছু ভাবতে হয় না।'

এগিয়ে গিয়ে বাণীর ছোট্ট হাতটা মুঠোর ভেতর নিয়ে মৃদু চাপ দিলাম, নিঃশব্দে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম তাকে। তারপর, একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই, শক্তিকে বললাম সে যেন বাণীকে নিয়ে ওদের পড়ার ঘরে চলে যায়, আমার জন্যে অপেক্ষা করে। বাচ্চাদের দায়িত্ব নেয়ার আগে স্বয়ং তাদের বাপের কাছ থেকে কয়েকটা ব্যাপার জেনে নিতে হবে আমাকে। এ তো আর নিজের জন্যে কিছু চাওয়া নয়, ওঁরই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ও ভাল-মন্দের কথা ভেবে, কাজেই আমার সঙ্কোচবোধ করার কিছু নেই।

'চলুন, আমার ঘরে গিয়ে বসা যাক,' বলে করিডর ধরে এগোলেন তারিক রহমান।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলাম আমি। মেহের আপা তাঁর ভাইয়ের সাথে আলাপ করা তো দূরের কথা, সামনে আসতেই নিষেধ করে দিয়েছেন। ওঁর ঘরে ঢুকেছি শুনলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর জানি না। তাছাড়া, মানা করুন বা না করুন, আজ এ-বাড়িতে আসতে না আসতে সরাসরি ওঁর ঘরে ঢোকা কি উচিত হবে আমার?

দাঁড়ালেন তারিক রহমান, একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ভয়ে ভয়ে, এক পা এক পা করে এগোলাম আমি। দরজার সামনে এসে দেখি, ভেতরে পিয়ানো, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে অবাক হয়ে তাকালেন তারিক রহমান, বললেন, 'কি হলো, ভেতরে ঢুকুন!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইতস্তত পা ফেলে ভেতরে ঢুকলাম।

'এখানে আমি সঙ্গীত-চর্চা করি, গান লিখি,' বললেন তারিক রহমান, এক পাশের একটা দরজার দিকে হাত তুললেন। 'ওটা আমার বেডরুম।' ছোট একটা টেবিল রয়েছে, ওপরে স্তূপ হয়ে আছে গাদা গাদা চিঠি। 'কি অবস্থা দেখছেন?'

'কি ওগুলো?'

'ভক্তদের চিঠি। সবাই আশা করে, প্রত্যেককে জবাব দেব। কিন্তু তা কি সম্ভব? কে কি লিখছে খুলে দেখার পর্যন্ত সময় হয় না। ভাবছি বাড়িতেও একজন সেক্রেটারিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেব কিনা, শুধু চিঠির জবাব দেয়ার জন্যে···।'

আমি বললাম, 'আপনাকে অনেক কাজ করতে হয়, তাই না?'

'কিছু একটা অর্জন করতে হলে অনেক কাজ আপনাকে করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। ব্যাপারটা আপনিও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন, শিমুল।'

শুরু করলাম হঠাৎ করেই, 'বলা যায় খানিকটা দিশেহারাবোধ করছি আমি, রহমান সাহেব···।'

'উঁহুঁ, উঁহুঁ!' বাধা দিলেন তারিক রহমান। 'সাহেব-টাহেব চলবে না। তাহলে আমিও আপনাকে বিবি বা বেগম বলব। সাহেবাও বলতে পারি। ভাই বলুন। না হয় পুরো নামটা উচ্চারণ করুন, তারিক রহমান।'

ক্ষীণ হেসে মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'তারিক ভাই, কয়েকটা ব্যাপারে আমি বিভ্রান্তিতে ভুগছি। আশা করি প্রশ্ন করলে আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার বোনের একটা কথা আমি বুঝতে পারিনি···মানে মেহের আপার কথা বলছি···উনি বলছেন···।' খেই হারিয়ে ফেললাম, কি বলব বুঝতে পারছি না।

'হ্যাঁ, বলুন!'

'ব্যাপারটা···ওদের মা'কে নিয়ে।'

পলকের মধ্যে ওঁর চেহারা বদলে যেতে দেখলাম। হঠাৎ করে যেন একটা মুখোশ নেমে এল চেহারায়, আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তারিক রহমান। ধীরে ধীরে ঘুরলেন, বড় একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমার দিকে পিছন ফিরে। দরজার বাইরে ঝুল-বারান্দা, রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। 'ওদের মা'কে নিয়ে কি ব্যাপার?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন তিনি, আমার দিকে ফিরলেন না।

'না, মানে···মেহের আপা বললেন, বাচ্চাদের সামনে তাঁর কথা তোলা যাবে না। আমি জানতে চাইছি, ওরা কি ওদের মায়ের কথা কখনও জিজ্ঞেস করে না? আপনি চান না, মায়ের কথা মনে রাখুক ওরা? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগল আমার। ওরা যদি এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে, কি বলব আমি?'

তারিক রহমান ভদ্রতা বজায় রাখলেন বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম রাগ চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা সুরে তিনি বললেন, 'তিন বছর আগে আমার স্ত্রী রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। বাচ্চারা যদি ওদের মায়ের কথা কিছু বলে, স্বভাবতই

আপনি ওদেরকে বাধা দেবেন না বা নিষেধ করবেন না। এখানে তো আছেই, আমাদের ঢাকা ও দেশের বাড়িতেও ওদের মায়ের ছবি আছে, ছবিগুলোর সাথে ওদেরকে আমি কথা বলতেও দেখেছি।' দরজার কাছ থেকে সরে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন তিনি, টেবিলের ওপর আঙুল নাচালেন বার কয়েক। 'এ-ব্যাপারে আমাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে—আমার আর মেহের আপার কথা বলছি। মেহের আপার ধারণা, শারমিনের নাম এ-বাড়ির কারও মুখে না থাকাই ভাল। এ-ব্যাপারে ওঁর সাথে আমি কখনও তর্ক করিনি বা করব না। তবে ওঁর সাথে আমি একমত নই।'

আমি কিছু বললাম না।

তারিক রহমান আবার বললেন, 'আমি শুধু চাইব, আপনি একটু কৌশল অবলম্বন করবেন। শারমিন সম্পর্কে খারাপ কিছু যদি আপনার কানে আসে, বাচ্চাদেরকে তা জানতে দেবেন না। আমি আশা করব, যেটা স্বাভাবিক সেটাই আপনি করবেন।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, স্বস্তি বোধ করলাম।

গলাটা পরিষ্কার করলেন তারিক রহমান। মুখোশটা চেহারা থেকে খসে পড়ল। আবার আমি ওঁর মুখে মিষ্টি, ভদ্র হাসি দেখতে পেলাম। 'একদিন সময় করে বাচ্চাদের নিয়ে আমার এই ঘরে আসবেন আপনি, আপনাকে আমি আমার পাওয়া পুরস্কার আর ছবিগুলো দেখাব। আমি চাই, আমাদের সাথে আমাদের একজন হয়েই থাকবেন আপনি। বিশেষ করে আপনি যদি বাচ্চাদের আপনজন হয়ে উঠতে না পারেন, ওরা আপনার কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারবে না। ওদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে আপনার, যেভাবে ভাল মনে করবেন সেভাবে মানুষ করার চেষ্টা করবেন। ভাল কথা, আপনার ছুটির কথা মেহের আপা কিছু বলেছে? আমার শয়তান দুটোকে সামলানো খুব কঠিন কাজ, হপ্তায় দেড়দিন ছুটি না পেলে হাঁপিয়ে উঠবেন আপনি। মাঝে মধ্যে ঢাকায় আপনার ভাইয়ের কাছ থেকেও বেড়িয়ে আসতে পারবেন।'

'ছুটি দরকার হলে আমি জানাব,' মৃদুকণ্ঠে বললাম। 'এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'হঠাৎ মনে হলো, আপনাকে আরেকটা দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে···।' তারিক রহমান ইতস্তত করছেন।

'বলুন, কি দায়িত্ব?' আগ্রহ নিয়ে তাকালাম আমি।

'বলছিলাম না, ভক্তদের চিঠির উত্তর দেয়ার জন্যে একজন সেক্রেটারি রাখব কিনা ভাবছি? আপনি···মানে যদি সময় করতে পারেন···এর জন্যে আপনি আলাদা একটা অ্যামাউন্ট পাবেন···।'

নিজের সৌভাগ্যে আমি হেসে উঠলাম। বিখ্যাত শিল্পী তারিক রহমানের ভক্তদের চিঠির জবাব দেব আমি! আমি ওঁর সেক্রেটারি হব! 'আপনি আমাকে লজ্জা দেবেন না, প্লীজ। অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না, এ-দায়িত্ব পেলে নিজেকে আমি ভাগ্যবতী মনে করব

কিন্তু লক্ষ করলাম, আমার কথায় কান নেই তারিক রহমানের। আমার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। আবার আমার শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল।

'আপনার হাসি এত মিষ্টি কেন?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। ভাবছি, এটা কোন প্রশ্ন হলো? 'জ্বী?'

'যার গলা এত মিষ্টি, তার গান তো একদিন শুনতে হবে!'

'আমি···গান গাইব···আপনার সামনে?' লজ্জায় ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, একরকম ছুটেই বেরিয়ে এলাম কামরা থেকে।

করিডরে বেরিয়েই সামনে পড়লাম মেহের আপার। করিডরের শেষ মাথায় হুইলচেয়ারে বসে রয়েছেন তিনি, রক্তচক্ষু মেলে একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। ঠাণ্ডা, চাপা গলায় হিসহিস করে উঠলেন তিনি, 'আমার ভাইকে বিরক্ত করাটা অভ্যেসে পরিণত কোরো না। বাচ্চাদের ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কি ঘটছে না ঘটছে, ওকে জানাবার দরকার নেই। তোমার কোন সমস্যা থাকলে আমিই সমাধান করব, ওকে জ্বালাতন কোরো না।'

'ঠিক আছে, মেহের আপা,' বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম।

আমাকে পাশ কাটিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে গেল তাঁর হুইলচেয়ার, তারিক রহমানের কামরায় ঢুকলেন তিনি। মনে একরাশ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে বাচ্চাদের ঘরের দিকে এগোলাম আমি।

দুই

সামিনার সাথে বাচ্চাদের কামরা আর আমার বেডরুম দেখতে এলাম। বাণীকে আমি শিশুই বলব, তাকে একা একটা কামরায় শুতে হয় শুনে বিস্মিত হলাম। মা নেই, মেহের আপা ইচ্ছে করলে মেয়েটিকে নিজের কাছে নিয়ে শুতে পারতেন। কি জানি, বাংলাদেশের ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরাও বোধহয় ইউরোপ-আমেরিকান স্টাইলে বড় হয়, সবাই আলাদা কামরায় শোয় তারা। আমার কামরাটা বেশি বড় নয়, তবে খুবই সুন্দর। ছোট একটা টেবিল, দু'খানা ফোম লাগানো চেয়ার, ছোট একটা শো-কেস, ওয়ার্ডরোব, খাট ইত্যাদি রয়েছে। ওয়ার্ডরোবটা খালি নয় দেখে একটু অস্বস্তিবোধ করলাম, সেটা লক্ষ করে ভেতর থেকে পাঁচ-সাতটা শাড়ি বের করল সামিনা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কার ওগুলো?' সবই সাদা শাড়ি।

আমার কথার কোন জবাব না [illegible]য় কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সামিনা। খারাপই লাগল আমার। ধারণা করলাম, মেহের আপার খাস চাকরানী বলে হয়তো খুব ডাঁট নিয়ে চলাফেরা করে মেয়েটা।

ইতিমধ্যে নিজেদের ঝগড়া ভুলে দু'ভাইবোন হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। দু'জনেই উৎসাহের সাথে এটা-সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে আমাকে। শক্তি এখন আর আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকছে না। সে-ই বলল, 'ওগুলো আকলিমা নানীর শাড়ি।'

আকলিমা কে? নামটা মোরশেদ খানের মুখে একবার শুনেছি, মনে পড়ল। 'ওঁকে তো চিনলাম না, কে উনি?'

শাড়িগুলো রেখে ফিরে এল সামিনা, জবাবটা সে-ই দিল, 'আকলিমা চাচী-মা চলে গেছেন। বেগম সাহেবার কি রকম যেন চাচী উনি। বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন।'

'চলে গেছেন কেন?'

'বেগম সাহেবা নেই, তাই। জন্মের পর থেকে বাণী আপাকে তিনিই তো মানুষ করেছেন। বাণী আপা বড় হয়ে গেছেন, তাই আকলিমা চাচীকে আর দরকার হলো না। তাছাড়া, বুড়ি মানুষ, কোন কাজ করতে পারতেন না, সারাদিন শুধু বকবক করতেন।'

'ও।' আগেই আমার সুটকেস দুটো কামরায় রেখে গেছে শরাফত মিয়া। সেগুলো খুলে জিনিস-পত্র বের করছি, বাচ্চারা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে সব।

'শিমুল আন্টি, আপনার মাত্র চারটে শাড়ি!' অবাক হয়ে বলল শক্তি। 'আমার ফুফু-আম্মার কত শাড়ি জানেন? পঞ্চাশটা!' তার চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু স্পষ্ট।

'কেন, আমার তো সালোয়ার-কামিজও রয়েছে দু'সেট।' হাসলাম আমি।

'ফুফু-আম্মারও ওসব আছে, অ-নে-ক। এগুলোর চেয়ে কত ভাল সেগুলো!'

'ভাল তো হবেই, তোমার ফুফু-আম্মা আর আমার অবস্থা তো এক রকম নয়।'

অতটুকু বাচ্চা, তার চেহারায় রীতিমত নগ্ন ঘৃণা ফুটে উঠল। 'তারমানে কি, শিমুল আন্টি, আপনি গরীব?'

'খুবই গরীব,' হাসতে হাসতে বলি আমি।

তাকিয়ে থাকল শক্তি। 'সামিনার মত? সামিনারা না খুবই গরীব। সে তো আমাদের এখানে কাপড় কাচে, মেঝে মোছে, আর বলে তার ভাই-বোনরা নাকি মাসে দু'তিন দিনের বেশি পেটভরে খেতেই পায় না। মাসে একদিনও নাকি চোখে মাংস দেখতে পায় না।'

'আমাকে ঠিক অতটা গরীব বলা চলে না।'

'ফুফু-আম্মা বলে, টাকা ছাড়া মানুষের জীবনের কোন দাম নেই,' চিবুক উঁচু করে বলল শক্তি, যেন রায় ঘোষণা করল।

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, মাথাটা দ্রুত কাজ করে, ঠিকমত গাইড করতে না পারলে ধূর্ত হয়ে উঠবে। বাণী এখনও ছোট, অতটা বুদ্ধিও তার নেই, তবে মনটা খুব সরল ও উদার, সবকিছুর মধ্যে কোমল একটা ভাব আছে। মেয়েটা হঠাৎ করল কি, এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'শিমুল আন্টি, তুমি খুব ভাল। কিন্তু ফুফু-আম্মা পচা!'

'বাণী!' চোখ রাঙাল শক্তি। 'দাঁড়াও, এখুনি আমি ফুফু-আম্মাকে গিয়ে বলছি!' দরজার দিকে এগোল শক্তি।

তাড়াতাড়ি আমি তার পথ আগলে দাঁড়ালাম। 'শক্তি, শোনো,' বললাম। 'আজ প্রথম দিন এসেই তোমাকে আমি শাসন করতে চাই না। কিন্তু তুমি বাড়াবাড়ি করছ দেখে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিই। তুমি এখনও ছোট, আর ছোট থাকতেই তোমাকে শিখতে হবে যে একজনের কথা আরেকজনকে বলতে নেই। খানিক আগে তোমার আব্বুকে তুমি বাণীর কথা বলেছ। তুমি কি চাও তোমার বোন বিপদে-পড়ুক? ও না তোমার একমাত্র বোন?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল শক্তির মধ্যে। মেহের আপা যে পাজি একটা মহিলা, ইতিমধ্যে তা আমি বুঝে নিয়েছি। তার প্রভাবেই নষ্ট হতে বসেছে কচি ছেলেটা। আমার দায়িত্ব ওই অসৎ মেয়েলোকটার অশুভ প্রভাব থেকে ছেলেটাকে মুক্ত করে আনা।

মুখ হাঁড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকল সে, আমার দিকে তাকাল না।

আবার বললাম, 'তুমি চাও না, বাণীও তোমার সাথে সুইমিং পুলে সাঁতার শিখুক? ওকে বাদ দিয়ে একা সাঁতার শিখতে তোমার খারাপ লাগবে না? ও তো তোমারই বোন।'

পরম স্বস্তির সাথে লক্ষ করলাম, শক্তির চোখে পানি বেরিয়ে এসেছে। তার চেহারা লাল হয়ে উঠল, বিড়বিড় করে বলল, 'আমি চাই বাণী আমার সাথে সাঁতার শিখুক।'

'তুমি এ-ও নিশ্চয়ই চাও না যে বাণী বিপদে পড়ুক?'

মাথা নাড়ল শক্তি। 'না, চাই না।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' কাছে টেনে আদর করলাম শক্তিকে, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে দিলাম। এবার চলো, আমাকে তোমাদের পড়ার ঘরটা দেখাবে।'

ওদের পড়ার ঘরটা বেশ বড়। দুটো টেবিল ও ছ'টা চেয়ার ফেলার পরও প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে। একধারে একটা ব্ল্যাকবোর্ডও আছে।

'শিমুল আন্টি, রোজ কতক্ষণ পড়তে হবে আমাকে?' জানতে চাইল শক্তি।

'আট ঘণ্টা, শুধু শুক্রবারে ছুটি,' বললাম আমি। 'স্কুল একদিনও কামাই করা চলবে না।' সুটকেস থেকে বাচ্চাদের ক'টা গল্পের বই বের করে ওদেরকে দেখালাম। 'এগুলোও তোমাদেরকে পড়তে হবে।' ছবিবহুল বইগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল ওরা।

শক্তি একটা বই হাতে নিয়ে বলল, 'এটা আবার কি বই?'

'এটা অঙ্ক বই,' বললাম আমি। 'স্কুলের অঙ্ক ছাড়াও তোমাদেরকে এই বই থেকে শিখতে হবে।'

'আমি রূপকথা শুনব!' আবদার ধরল বাণী, তার হাতে ভূতের ছবিঅলা একটা বই।

কচি গালটা টিপে দিয়ে বললাম, 'রোজ রাতেই শোবার আগে শোনানো হবে, বুঝলে!'

'কি মজা! কি মজা!' ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুমো খেল বাণী।

আনন্দে হাততালি দিচ্ছে শক্তিও, কিন্তু হঠাৎ থেমে বাণীর দিকে কড়া চোখে তাকাল সে। বুঝলাম, মেহের আপা অনাত্মীয় কাউকে চুমো খেতে নিষেধ করেছেন, সে-কথা মনে পড়ে গেছে তার। বাণীর মাথায় হাত রেখে বললাম, 'গুরুজনেরা যা বলে, মেনে চলতে হয়, বাণী। তোমাকে এই চুমো খাবার অভ্যেসটা ছাড়তে হবে।'

'তাহলে কাকে আমি চুমো খাব? আমার কি আম্মু আছে? আকলিমা দিদা ছিল, ফুফু-আম্মা তাকে তাড়িয়ে দিল।'

বাচ্চা মেয়েটা এমন বিষণ্ন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল, বুকটা টনটন করে উঠল আমার। বললাম, 'কেন, তোমার আব্বু আছেন, ফুফু-আম্মা আছেন···।'

'আব্বু তো মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসে! আর ফুফু-আম্মাকে আমার ভাল লাগে না!'

'বাণী!' আবার চোখ রাঙাল শক্তি।

'তুমি চুপ করো,' শক্তিকে বললাম আমি। 'ওকে শাসন করবে বড়রা, তুমি নও,' ফিরলাম বাণীর দিকে। 'এভাবে কথা বলা উচিত নয়, বাণী। ফুফু-আম্মা তোমার গুরুজন। তাঁকে তোমার ভাল লাগবে না কেন?'

'ফুফু-আম্মা শুধু শক্তিকে আদর করে, আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না!' হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বাণী।

তার কান্নাটাকে আমি প্রশ্রয় দিলাম না। বললাম, 'ভাল মেয়েরা কথায় কথায় কাঁদে না। ফুফু-আম্মা তোমাকে দেখতে পারে না, এটা তোমার ভুল ধারণা। তুমি যদি ভাল হও, নিশ্চয়ই তোমাকেও তিনি আদর করবেন।' তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিলাম আমি। 'এবার এসো, তোমাদের রুটিনটা তৈরি করে ফেলি।'

রুটিন তৈরির এক ফাঁকে আমার ছাত্র-ছাত্রীর মেধাও একটু পরীক্ষা করে নিলাম।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, একটু মনোযোগ দিলেই কঠিন যে-কোন পড়া সহজেই বুঝে নিতে পারে শক্তি, দ্রুত মুখস্থ করার দুর্লভ গুণও তার রয়েছে। তবে ভাল ছাত্র হবার জন্যে মনোযোগ স্থির রাখার সময়টা তাকে বাড়াতে হবে। আমি যদি শেষ পর্যন্ত এ-বাড়িতে টিকে যাই, আগামী বছর ফাইন্যাল পরীক্ষায় খুবই ভাল রেজাল্ট করবে সে।

একটু পরই সুইমিং পুলে যাবার জন্যে তাগাদা দিতে শুরু করল শক্তি। মনটা খারাপ হয়ে গেল বাণীর কথা ভেবে। মেহের আপার নিষেধ অমান্য করে তাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। এই সময় তারিক রহমানকে পড়ার ঘরে উঁকি দিতে দেখলাম। উনি এখনও কাপড় ছাড়েননি দেখে অবাকই হলাম আমি। বললেন, 'আমার পোলা-মাইয়া রেডি তো? শপিং করতে নিয়ে যেতে চাইলে তোমরা যাবে?'

বই-খাতা ফেলে বাপের দিকে ছুটল ওরা। ওগুলো গুছিয়ে রেখে আমিও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, মেয়েকে কোলে নিয়ে তার কানে কানে ফিসফিস করছেন তারিক রহমান।

বাপ ও মেয়ে, দু'জনেই আমার দিকে তাকিয়ে। বাণী বলল, 'শিমুল আন্টি না গেলে আমি যাবই না!'

'যাই, আমিও তাহলে ফুফু-আম্মাকে ডেকে আনি,' দরজার দিকে এগোল শক্তি।

তারিক রহমান বললেন, 'তোমার ফুফু-আম্মা আবার কবে আমাদের সাথে শপিং করতে গেলেন! ধমক খাবার ইচ্ছে থাকলে যাও।'

'কেন, ফুফু-আম্মা কেন আমাদের সাথে যাবে?' ঝাঁঝের সাথে জানত চাইল বাণী। 'ফুফা তো প্রতি রোববারে তাঁকে শপিং করতে নিয়ে যান, তখন তো আমরা যেতে চাইলেও নিতে চায় না।'

তারিক রহমান আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'আপনিও কিন্তু আমাদের সাথে যাচ্ছেন।'

'না, সে কি, আমি কেন যাব।'

'শিমুল আন্টি, তুমি না গেলে আমি যাব না!' আবদার ধরল বাণী।

'এত করে যখন বলছে, চলুন না!' অনুরোধ করলেন তারিক রহমান।

কি বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকলাম। এটা যে বাপ-বেটির ছোট্ট একটা ষড়যন্ত্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল সবাই, অগত্যা বাধ্য হয়েই ওদের পিছু নিলাম। তবে বাড়ি থেকে বেরুবার আগে তারিক রহমানকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললাম না যে মেহের আপা বিশটা অঙ্ক করতে বলেছেন বাণীকে।

ভুরু দুটো মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে উঠল ওঁর। তারপরই দুষ্ট হাসি দেখা গেল মুখে, ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে আমাকে চুপ করে যেতে বললেন। 'অঙ্ক পরে করলেও চলবে। এখন তো পালাই, পরে আমি মেহের আপাকে বুঝিয়ে বলব। আজই আমি বাড়ি ফিরেছি, মা-মণিকে একা বসে অঙ্ক করতে দেখলে ভাল লাগবে না আমার।'

আমার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, বললাম, 'শক্তি, তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি কাপড় পাল্টে···।'

আমার কথা শেষ হলো না, দ্রুত আমার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারিক রহমান বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও ধারণা সালোয়ার-কামিজ পরলেই মানাবে আপনাকে।'

হেসে ফেললাম, পরমুহূর্তে একরাশ লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। 'আপনি কি করে জানলেন কি পরব আমি?'

'ফিগার বলে একটা কিছু যদি কোন মেয়ের থাকে, নিশ্চয়ই সেটা সম্পর্কে সচেতন সে,' হাসতে হাসতে বললেন তারিক রহমান, সম্ভবত আমি আড়ষ্টবোধ করছি বলেই অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন, দুহাত দিয়ে ধরে বাণীকে তুলে নিলেন কাঁধে। 'আর সচেতন হলে তার জানার কথা কি পরলে তাকে মানাবে।'

নিজের ঘরে চলে এলাম। সবুজ সিল্ক সালোয়ার-কামিজ বানাবার পর একবারও পরিনি, ওটাই বেছে নিলাম আমি, সাথে একই রঙের ওড়না।

করিডরে বেরিয়ে এসে হলঘরের দিকে এগোচ্ছি, একটা ভয় ঢুকল মনে। মেহের আপা না বাদ সাধেন। যা ভেবেছি তাই, হলঘরে ঢুকেই হুইলচেয়ারটা দেখতে পেলাম। সবার পিছু পিছু বারান্দায় বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ভয়ে ভয়ে আমিও বেরিয়ে এলাম। 'তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ ওদের সাথে?'

'বাণীকে জিজ্ঞেস করো, মেহের আপা,' তাড়াতাড়ি বললেন তারিক রহমান। 'ওর একই জেদ, শিমুল আন্টি সাথে না থাকলে শপিং করতে যাবে না ও।'

'শপিং করতে যাবে···বাণী?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন মেহের আপা, চোখে অভিযোগ, তাকিয়ে আছেন সরাসরি আমার দিকে। 'কিন্তু আমি না হুকুম দিলাম, বিশটা অঙ্ক করতে হবে ওকে?'

কথা না বলে চুপ করে থাকলাম আমি।

আমার হয়ে জবাব দিলেন তারিক রহমান, 'এবারের মত ওকে মাফ করে দাও, মেহের আপা। অপরাধ করেছে বটে, তবে সেটা তত গুরুতর বলা চলে না। মা-মণি, এবার থেকে ফুফু-আম্মার সব কথা মেনে চলবে, ঠিক তো?' বাপের কাঁধে বসে গলা জড়িয়ে ধরেছে মেয়ে। মাথা ঝাঁকাল সে।

রাগে লালচে হয়ে উঠতে দেখলাম মেহের আপার চেহারা। 'দেখ তারিক, তোর এভাবে নাক গলানো উচিত নয়। এ-বাড়ির মেয়ে, আদব-কায়দা শিখবে না, এ আমি ভাবতে পারি না। ওকে তুই লাই দিয়ে মাথায় তুলছিস। পরে কিন্তু পস্তাতে হবে, এই বলে দিলাম!'

হেসে উঠলেন তারিক রহমান, বাণীর চুলের ডগা ধরে মৃদু টান দিলেন। 'মা-মণি আসলে ওর বাপের মতই লাজুক, তাই নারে? আরেকটু বয়েস হোক, তখন সবই শিখবে।' আমার দিকে তাকালেন তিনি। দেখেও বিশ্বাস হলো না, উনি সত্যি আমার উদ্দেশে চোখ মটকালেন, ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত। ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা শরীরে। তারুণ্যসুলভ কৌতুক করতে এই প্রথম দেখলাম ওকে। আমার দৃষ্টিতে স্বাভাবিকই লাগল। মানুষ যত ব্যস্তই হোক, অবসর সময়ে যদি হাসতে না পারে, বেঁচে থাকা তার জন্যে সুখকর হতে পারে না। স্ত্রী মারা যাবার পর আমার প্রিয় শিল্পী শোকে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, এটুকু বেশ বোঝা যায়। ধীরে ধীরে হলেও আঘাতটা তিনি কাটিয়ে উঠছেন।

পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠলেন মেহের আপা, বললেন, 'ঠিক আছে, এবারের মত আমি কিছু বললাম না তোর আদরের মা-মণিকে। কিন্তু পরের বার আমি কিন্তু মাফ করব না।'

'পরে আর ওরা কোন অপরাধ করলে তো!' হেসে উঠলেন তারিক রহমান। 'শিমুল আন্টি ওদেরকে কড়া শাসনে রাখবেন। শিমুলকে আমি বলে দিয়েছি, সমস্ত দায়িত্ব তাঁর। এমন কড়া হতে বলেছি, এমনকি আমি অনুরোধ করলেও ওরা আর মাফ পাবে না। প্রতিবার বাড়িতে এসে শিমুলের কাছ থেকে রিপোর্ট নেব আমি।'

'সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে,' তিরস্কারের সুরে বললেন মেহের আপা। 'শিমুলকে তোর কাছে রিপোর্ট করতে হবে কেন? আমি তাহলে এ-বাড়িতে কি করতে আছি?'

'আপাতত,' তাড়াতাড়ি বললেন তারিক রহমান। 'যতদিন না ওরা আদব-কায়দা ঠিকমত শেখে। আমি দেখতে চাই, কেন ওরা তোমার কথা শোনে না।'

'ওরা নয়, কথা শোনে না একজনই, লাই দিয়ে যাকে তুই মাথায় তুলে রেখেছিস!' ঝাঁঝের সাথে বললেন মেহের আপা, তারপর আমার দিকে ফিরলেন। 'বাণী জেদ ধরল, আর তুমিও নাচতে নাচতে ওদের সাথে বেরিয়ে পড়লে? ওরা যাচ্ছে যাক, তোমার যাবার দরকার নেই।'

এবারও আমি চুপ করে থাকলাম।

'আপনার কি জরুরি কোন কাজ আছে, শিমুল?' জানতে চাইলেন তারিক রহমান।

প্রথম থেকেই সঙ্কোচবোধ করছি, ওদের সাথে যাবার ইচ্ছে সত্যি আমার নেই। কিন্তু আমি না গেলে মেহের আপা খুশি হবেন, ভাববেন তাঁর জিত হয়েছে। তাঁকে খুশি হবার সুযোগ দিতে মন চাইল না। বললাম, 'না, কোন কাজই নেই আমার।'

'তাহলে একা একা বসে থাকবেন কেন, চলুন আমাদের সাথে। ওদের জন্যে কিছু গল্পের বইও বাছাই করতে পারবেন।'

হিংস্র দৃষ্টি যদি মানুষকে খুন করতে পারত, এই মুহূর্তে মেহের আপা আমাকে ঠিক তা-ই করতেন। রক্তমাংসের মানুষ আমি, তাঁর পরাজয়ে যে পুলক অনুভব করলাম সেটা সত্যি উপভোগ্য। তারিক রহমানের পিছু নিয়ে গাড়ি বারান্দায় নেমে এলাম আমি। দেখলাম, নতুন মডেলের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। এটা সেই সাদা টয়োটা নয়। টয়োটাই, তবে এটার রঙ লাল। ভাবলাম, এদের গাড়ি আসলে কটা?

শহরের সবচেয়ে অভিজাত শপিং সেন্টারে দেড় ঘণ্টা ধরে কেনাকাটা করলাম আমরা। বাচ্চাদের জন্যে প্রচুর জিনিস কেনা হলো, তবে তারিক রহমানকে অপব্যয়ী বলা যাবে না। যে-সব খেলনা বাড়িতে আছে বা কেনার পর বাচ্চারা ভেঙে ফেলেছে, সেগুলোর একটাও তিনি কিনে দিতে রাজি হলেন না। ওদের ড্রেসও কেনা হলো শুধু নতুন ডিজাইনের, যেগুলো ওদের নেই। তারপর ভয়ানক অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করল।

দোকানে দোকানে ঘুরছি, বাণী কিন্তু একবারও বাপের কাঁধ থেকে নিচে নামেনি। বাপ-বেটিতে সারাক্ষণ ফিসফাস আলাপ চলছে। রেডিমেড গার্মেন্টস-এর এক দোকানে ঢুকেই হাত লম্বা করে একটা থ্রী-পীস দেখাল বাণী, 'ওটা।'

দোকানের কর্মচারী তারিক রহমানের দিকে তাকাল, তারিক রহমান নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লেখা হয়ে গেল মেমো। আমার হাতের শপিং ব্যাগে প্যাকেট করা থ্রী-পীস জায়গা করে নিল।

'আমি···এটা কার জন্যে···?'

'ওটা!' আবার চিৎকার করল বাণী। 'আর ওটা!' থ্রী-পীস, পাঞ্জাবী সেট, স্কার্ট,

যেটাই তার চোখে ধরছে, হাত লম্বা করে দেখিয়ে দিচ্ছে।

ঘেমে গেলাম আমি। প্রতিবাদ করে বললাম, 'ছি-ছি, এ স্রেফ পাগলামি! তারিক ভাই, এ আপনি কি করছেন? এসব আমার দরকার নেই, শুধু শুধু···।'

লক্ষ করলাম, তারিক রহমানের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে মেমো লেখার কাজ পুরোদমে চলছে। আরেক কর্মচারী তিনটে প্যাকেট তৈরি করে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। পিছু হটলাম আমি, শপিং ব্যাগে ভরতে রাজি হলাম না। বললাম, 'না। একটাই যথেষ্ট, ওগুলো আবার টাঙিয়ে রাখুন।'

'যদি কিছু বলার থাকে আপনার, ওদেরকে বা আমাকে কিছু না বলে বাণীকে বলুন,' ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে বললেন তারিক রহমান। 'আমরা কেউ নই, উপহারগুলো ওর তরফ থেকে পাচ্ছেন আপনি!'

কিন্তু ছোট্ট বাণী ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিল। 'আমার কি দোষ, আব্বুই তো আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে!'

'এই যাহ্!' দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন তারিক রহমান, প্যাকেটগুলো ইতিমধ্যে নিজের ব্যাগে ভরে নিয়েছেন তিনি। অগত্যা বাধ্য হয়ে শক্তির পিছু পিছু আমাকেও বেরিয়ে আসতে হলো।

এরপর বই আর খাতা-পেন্সিল কিনল ওরা। সঙ্গে থাকলাম, কিন্তু কারও সাথে কথা বললাম না। দু' একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন তারিক রহমান, কিন্তু আমার চেহারা দেখে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মেজাজ বুঝতে পেরে বাচ্চারাও আর আগের মত হাসাহাসি করছে না। এই সময় সবাইকে নিয়ে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকলেন তারিক রহমান। এখানে বাণী আর শক্তির জন্যে লাইফজ্যাকেট কেনা হলো। বাচ্চারা এটা-সেটা দেখছে, আমাকে এক পাশে ডেকে নিলেন তারিক রহমান। বললেন, 'আপনি মাইণ্ড করবেন জানলে সত্যি কাজটা করতাম না। যা হবার হয়েছে, কথা দিচ্ছি এরকম বোকামি আর কখনও হবে না। তবে, আপনাকে বলা দরকার, কিছু ভেবে বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসব আমি কিনিনি। যখন কিনি, বাড়ির সবার জন্যেই কিনি। তবে, একটা জিনিস বোধহয় দরকার আপনার—শখের নয়, কাজের জিনিস। বুঝতে পারছি না প্রসঙ্গটা কিভাবে তুলব।'

'কাজের জিনিস? কি জিনিস?'

'তার আগে জেনে নেয়া যাক, আমাদের সুইমিং পুলে আপনার কি আদৌ নামার ইচ্ছে আছে? মানে, নিজে গোসল করার জন্যে বা ওদেরকে সাঁতার শেখানোর জন্যে?'

'সুইমিং পুলে নামতে পারি, সেখানে যদি কোন পুরুষ না থাকে,' বললাম আমি। 'বাঙালী মেয়ে তো···'

'বাঙালী মেয়ের এই সম্ভ্রমবোধ প্রশংসনীয়,' সহাস্যে বললেন তারিক রহমান। 'আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। নেক্সট কোশ্চেন—সুইমিং পুলে নামতে হলে শাড়ি অচল, সেক্ষেত্রে কি পরবেন আপনি? সুইমিং কস্টিউম?'

'কেন, সালোয়ার-কামিজ?'

'যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন কি? বাচ্চারা ছাড়া আশপাশে কেউ যদি না থাকে, ইমিং কস্টিউম পরা[illegible] বাধা কিসের?'

[illegible] ব্যক্তিগত সংস্কার ও অনভ্যাস

চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য, ঘন ঘন মাথা নাড়লেন তারিক রহমান। 'উচিত হবে না, কারও ব্যক্তিগত সংস্কারে আঘাত হানা একদম উচিত হবে না। তাহলে সালোয়ার-কামিজই পরবেন আপনি। যদিও সেটা সুইমিং কস্টিউম পরার চেয়ে ভাল কিনা আমি জানি না। সালোয়ার-কামিজের একটা বিচ্ছিরি প্রবণতা হলো, ভেজা হলে, গায়ের সাথে সেঁটে থাকা। সে যাক, ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপর কথা চলে না।' আমাকে নিয়ে কাউন্টারের কাছে ফিরে এলেন তিনি, কর্মচারীকে বললেন, 'দু'সেট সালোয়ার-কামিজ, তাড়াতাড়ি।' আমি প্রতিবাদ করার আগেই তিনি বললেন, 'এগুলোর দাম আপনি বেতন থেকে কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, ঠিক আছে?'

বাড়িতে ফিরে এসে আমার প্রিয় শিল্পীকে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। বললাম, 'ওদের সাথে আপনিই যখন আছেন, আজ আর আমি সুইমিং পুলে গেলাম না, কেমন?'

'না-না, সেকি! সকালে একবার গোসল করেছি আমি, এখন আবার পানিতে নামতে চাই না। ক'টা ফাইল দেখতে হবে আমাকে, আমি যাই। আধ ঘণ্টার বেশি থাকবেন না যেন। ঠিক আধ ঘণ্টা পর খেতে বসব আমরা।'

ভিজে কাপড়ে আমাকে দেখার কোন ইচ্ছে ওঁর নেই, বুঝতে পেরে ভাল লাগল। কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেলাম খেতে বসার প্রসঙ্গ ওঠায়। মেহের আপা বলে দিয়েছেন, তারিক রহমান বাড়িতে থাকলে ডাইনিং রুমে নয়, আমাকে খেতে বসতে হবে পড়ার ঘরে। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন কিছু না বলাই ভাল। সুইমিং পুল থেকে সরাসরি পড়ার ঘরে চলে যাব আমি।

এক-আধটু সাঁতার আগে থেকেই জানে শক্তি, তবে ভয় এখনও দুজনেরই কাটেনি। প্রথম দিন, শুধু পানি ছিটানোই সার হলো, সাঁতার শেখানোর ব্যাপারে আমি বিশেষ মনোযোগ দিলাম না। বিশ মিনিট পর ওদেরকে নিয়ে উঠে এলাম পানি থেকে। তিনজনই আমরা কাপড় পাল্টালাম, তারপর ফিরে এলাম বাড়ির ভেতর। শক্তি আর বাণী ওদের বাবার কাছে চলে গেল, আমি ঢুকলাম আমার ঘরে। ঢুকে দেখি, বিছানার ওপর সদ্য কেনা কাপড়ের প্যাকেটগুলো পড়ে রয়েছে। কে রেখে গেছে জানি না। মনটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। মেহের আপা যদি জানতে পারেন, তাঁর ভাই এ-সব আমাকে কিনে দিয়েছেন, না জানি কি বলেন আমাকে। ফ্যান ছেড়ে চুল শুকালাম। খুব ইচ্ছে হলো একটু সাজি, অন্তত সামান্য ক্রীম আর লিপস্টিক মাখি, কপালে ছোট্ট একটা টিপ দিই। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, নিজেকে প্রশ্রয় দেয়া হয়ে যাবে। থাক তাহলে, ভাবলাম। মেকআপ ছাড়াও আমাকে খারাপ দেখায় না। সুন্দরী না হতে পারি, কুৎসিত তো আর নই।

দশ মিনিট পর দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি সামিনা। মুখটা কেন যেন বেজার হয়ে আছে। বলল, 'আপনাকে খেতে ডাকছে।' বলেই চলে যাচ্ছিল সে, আমি তাকে বললাম, 'আমি পড়ার ঘরে খাব, কেমন? খাবারটা তুমি বরং ওখানে রেখে যাও।'

'ঠিক আছে,' বলে চলে গেল সে।

একটু পরই ঘরে ঢুকল শক্তি। 'শিমুল আন্টি, আব্বু তোমাকে নিতে পাঠাল। আমরা সবাই টেবিলে বসে আছি, তাড়াতাড়ি চলো।'

আদর করে শক্তির মুখে হাত বুলিয়ে বললাম, 'আমি পড়ার ঘরে খাব, সোনামণি।'

'কিন্তু বাণী যে বলছে, তোমাকে ছাড়া সে খাবে না!' আমার হাত ধরে টানতে লাগল শক্তি। 'চলো না!'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলাম, তারপর বললাম, 'বাণীকে গিয়ে বলো, কাল থেকে ওর সাথেই খাব আমি, কেমন?' কথাটা বলার সময় আমার কোন ধারণা ছিল না এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। 'আজ ওকে আব্বুর সাথে খেতে বলো।'

করিডরে বেরিয়ে এলাম, পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছি। বাঁক ঘুরে আমার সামনে দাঁড়ালেন তারিক রহমান। 'কি ব্যাপার, আপনি আসছেন না কেন?'

'ছি-ছি, টেবিল ছেড়ে আপনি কেন উঠে এলেন?'

'উঠে এলাম বাধ্য হয়ে। চলুন।'

'না, মানে, সামিনাকে বলেছি পড়ার ঘরে···।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'শুনেছি। কয়েকটা ব্যাপার আপনার হয়তো বুঝতে ভুল হয়েছে, শিমুল। আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে, শক্তি আর বাণীর সমস্ত দায়িত্ব আপনি নেবেন। ধরুন, খেতে বসে প্লেটের চারদিকে ভাত-তরকারী ছড়াল ওরা, ডান হাতে গ্লাস ধরল, নিজের খাওয়া হয়ে যেতেই কাউকে কিছু না বলে উঠে পড়ল, তখন কে ওদেরকে বারণ করবে? কে শেখাবে? আমি?'

'কেন, মেহের আপা তো আছেনই···।'

'মেহের আপা পঙ্গু মানুষ, ও যদি ওদেরকে সামলাতে পারত, তাহলে বৃষ্টির মধ্যে সেদিন আমি অমন করে ছিটকে বেরিয়ে যেতাম বাড়ি থেকে?'

'কিন্তু মেহের আপা চান···।'

'জানি, তা-ও আমি শুনেছি,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তারিক রহমান, অভয় দিয়ে হাসলেন। 'আসলে, একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মেহের আপা সরল মানুষ, বুঝতে দেরি করেছেন আর কি! আপনি যে এ-বাড়িরই একজন হয়ে থাকবেন, আপাকে আমি তা বুঝিয়ে দিয়েছি। বোঝার পর হাসিমুখেই রাজি হলেন, আপনি আমাদের সাথেই খাবেন। ভেবে দেখুন না, খাওয়ার সময় আপনি যদি কাছে না থাকেন, শয়তান দুটোকে টেবিল ম্যানার শেখাবে কে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি যান, আমি আসছি।'

'ধন্যবাদ,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন উনি।

পিছন থেকে ডাকলাম, 'শুনুন।'

দাঁড়ালেন উনি, ফিরলেন আমার দিকে।

'আগেও লক্ষ করেছি, ওদেরকে আপনি আদর করে শয়তান বলেন,' মৃদুকণ্ঠে বললাম। বুদ্ধিমান মানুষ, ধরে নিলাম আর কিছু বলার দরকার নেই, যা বোঝার এ-থেকেই বুঝে নেবেন।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। তারিক রহমান হাসলেন না। নিস্তব্ধতা ভেঙে বললেন, 'সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ।' ঘুরলেন আবার, চলে গেলেন।

নিজের ঘরে আর ফিরলাম না, ওখানেই কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর ধীর পায়ে এগোলাম ডাইনিং রুমের দিকে। ইচ্ছে করেই তারিক রহমানকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি, চাই না মেহের আপা আমাদের দু'জনকে একসাথে ঢুকতে দেখেন।

যা ভয় করেছিলাম, তা নয়; মেহের আপার চেহারায় রাগের কোন চিহ্ন নেই। ডাইনিং রুমটা লম্বাটে, কাচ লাগানো বিরাট জানালাগুলোয় পাতলা ফিনফিনে সিল্ক পর্দা ঝুলছে, যাতে প্রচুর রোদ আর বাতাস ঢুকতে পারে। মাথার ওপর ঝাড়বাতিও আছে।

টেবিলটাও লম্বাটে, চেয়ারগুলোর পিঠ উঁচু। এরকম চেয়ার-টেবিল বা খাবার, জীবনে কখনও দেখিনি আমি। এত দামি কার্পেটও না। কলাপাতা রঙের ওটা। জানালা দরজা বাদে ডাইনিং রুমের সবটুকু দেয়াল চকলেট রঙের কাঠের প্যানেলিং দিয়ে মোড়া। দুটো খোলা দরজা দিয়ে ঝুল-বারান্দা ও বাগানে বেরিয়ে যাওয়া যায়। টেবিলের ওপর চোখ পড়তে দম বন্ধ হয়ে এল। গ্লাসগুলো এত পাতলা আর লম্বা যে, আমি জানি, হাত দিয়ে ধরতে ভয় করবে আমার। টেবিলের মাঝখানে বিশাল একটা চিনামাটির থালা, দেশী-বিদেশী ফলের পাহাড় তাতে। টেবিলের দুপাশে ফুলদানিতে রাখা হয়েছে তাজা লাল ও সাদা গোলাপ। টেবিলের মাথায় বসেছেন তারিক রহমান। আরেক মাথায় কেউ বসেনি, ওদিকটা খালি রাখা হয়েছে। ধারণা করলাম, শারমিন সুলতানার জায়গাটা খালি রাখা হয়েছে। তারিক রহমানের বাম দিকে বসেছেন মেহের আপা, ডানদিকে মোরশেদ খান। এক ধারে দুই বাচ্চার মাঝখানে একটা চেয়ার খালি, আমার জন্যে।

নিঃশব্দে বসলাম চেয়ারটায়, যতটা সম্ভব চোখে না পড়ার চেষ্টা করছি। খাবারের কথা আর কি লিখব, আমার জানা অজানা সমস্ত ভাল ভাল খাবারই রয়েছে টেবিলের ওপর, প্রচুর পরিমাণে। যার যা দরকার তুলে নিচ্ছে, সাধাসাধির কোন ব্যাপার নেই। আমি শুধু শক্তি আর বাণীর সাথে কথা বলছি, নিচু স্বরে। একবার শুধু মোরশেদ খান জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, সুইমিং পুলটা কেমন লাগল আমার। মেহের আপা প্রচুর হাসছেন, কথাও বলছেন, তবে আমাকে কিছু বললেন না, এমনকি আমার দিকে একবার তাকালেনও না।

কোন ঘটনা ছাড়াই খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। আলোচনা থেকে বুঝলাম, এরপর বড়রা কফি খাবেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলাম আমি, বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, জানালাম দুপুরে খাওয়ার পর কফি বা চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার। ইচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে যাব। হুইলচেয়ার নিয়ে বাণীর কাছে চলে এলেন মেহের আপা। তাঁকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাণী, কিন্তু তারপর আর নড়ার শক্তি পেল না। বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল সে, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, একটা আঙুল মুখের ভেতর।

'বাণী, লক্ষ্মী সোনা, মুখ থেকে আঙুলটা বের করো এবার!' অদ্ভুত মিষ্টি গলা মেহের আপার, যেন ভাইঝিকে কত আদর করেন উনি।

বাণী গাল ফুলিয়ে চুপ করে থাকল।

এদিকে খেয়াল নেই তারিক রহমানের, ওঁর ভগ্নিপতির সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মগ্ন, দু'জনেই সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন এক কোণে ফেলা সোফাগুলোর দিকে।

মেহের আপার জন্যে মাঠ একেবারে ফাঁকা। ভাইকে উঠে যেতে দেখে তাঁর ভাষা ও চেহারা, দুটোই বদলে গেল। চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'কি বলছি, কথা কানে যাচ্ছে না?'

দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে বাণী, তাড়াতাড়ি আমি তার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, নরম সুরে বললাম, 'লক্ষ্মী আমার, মুখ থেকে আঙুল বের করো তো। তুমি না ভাল!'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মেহের আপা। 'তুমি কথা বলার কে? তোমাকে আমি কিছু বলতে বলেছি? খবরদার নাক গলাবে না!'

হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে এলাম আমি, বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। 'দুঃখিত, মেহের আপা। আমি ভাবলাম, ওরা যদি কোন ভুল করে আমাকেই তা দেখিয়ে দিতে

হবে··· ।'

'তুমি কতটুকু কি করবে সে আমার বোঝা হয়ে গেছে!' ভারি গলায় বললেন মেহের আপা। 'ঠিক আছে, এরপর যখন ভুল করবে দেখিয়ে দিয়ো। কিন্তু এখন যা ঘটছে, আমার আর বাণীর মধ্যে ঘটছে, তোমাকে নাক গলাতে হবে না। তুমি নিজেই তো আজ সকালে দেখলে, পাজী মেয়েটা আমাকে চুমো খেল না। আদর পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে, আমার কথা গ্রাহ্যই করে না। অতটুকুন মেয়ে, কি তার জেদ! আমি বললে যদি মুখ থেকে আঙুল বের না করে, তুমি বললে বের করবে কেন?'

মেহের আপার এ-কথা শুনেই আঙুলটা বের করে নিল বাণী, মাথাটা দ্রুত নেড়ে ছোট্ট বেণীটা দোলাল, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে, বলল, 'শিমুল আন্টি যা বলবে আমি তাই শুনব। শিমুল আন্টি পচা না, তুমি পচা!'

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশটা। নিস্তব্ধতা ভাঙল শক্তি, খিক খিক করে হেসে উঠে। মেহের আপার রাগ গিয়ে পড়ল তার ওপর, প্রিয় ভাইপোকেও ছাড়লেন না। 'চুপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠলেন তিনি। তারপর আমার দিকে তাকালেন, 'শিমুল, ওকে তুমি ওর কামরায় নিয়ে যাও। কাপড়চোপড় খুলে শুইয়ে দাও বিছানায়। আজ সারাদিন শুয়ে থাকবে ও।'

এত নার্ভাস হয়ে পড়েছি যে কি করব বুঝতে পারছি না। ছোট একটা দুধের বাচ্চার সাথে কোন মানুষ এরকম নির্দয় ব্যবহার করতে পারে, না দেখলে আমার বিশ্বাস হত না। কি আর এমন অন্যায় করেছে বেচারি যে সারাটা দিন বিছানায় আটকে রাখতে হবে? এই বদমেজাজী মহিলা বাচ্চাদের বোঝেন না, তাদেরকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেন, পদে পদে নতি স্বীকার করাতে চান। ইতিমধ্যে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কান্না জুড়ে দিয়েছে বাণী।

অসহায়ভাবে কামরার কোণে তাকালাম। আশা, যদি মেয়ের কান্না শুনতে পেয়ে এদিকে খেয়াল দেন তারিক রহমান। রাগে সারা শরীর জ্বালা করছে আমার।

মেহের আপা বললেন, 'শিমুল, তুমি দেখছি আমার হুকুম মানতে চাইছ না। তোমাকে বললাম না, ছুঁড়িটাকে সরাও এখান থেকে!'

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'এই পরিবেশে ওদের দায়িত্ব নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মেহের আপা। হয় ওদের সমস্ত ব্যাপার আমি দেখব, না হয় আপনি। কিছুটা দেখব আমি, কিছুটা আপনি, এ সম্ভব নয়। আমি ওদেরকে যেভাবে সবকিছু শেখাতে চাই তাতে যদি আপনি বাধা দেন, অশান্তির আর শেষ থাকবে না, ওরাও অবাধ্য হয়ে উঠবে। তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।'

হঠাৎ খেয়াল করলাম সোফা থেকে উঠে এদিকেই এগিয়ে আসছেন তারিক রহমান। 'মা-মণি, মা-মণি···প্লীজ!' মেয়ের সামনে এসে ঝুঁকলেন উনি, দু'হাতে নিজের কান দুটো চেপে রেখেছেন। 'আব্বু সুর ভালবাসে, কিন্তু তুমি গলা চড়ালে এত বেসুরো লাগে··· ।'

কেউ কিছু বলার আগেই শক্তি শুরু করে দিল, 'ফুফু-আম্মা বলল, কিন্তু বাণী মুখ থেকে আঙুল বের করবে না। শিমুল আন্টি বলল, অমনি বের করে ফেলল। তাই ফুফু-আম্মা শাস্তি দিয়েছে, বলেছে আজ সারা দিন বাণীকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে··· ।'

গম্ভীর হলো তারিক রহমানের চেহারা। ছেলেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বাণীকে নিয়ে পড়ার ঘরে চলে যাও—এখুনি। শক্তি, কোন তর্ক নয়!'

ধমক খেয়ে ঠোঁট ফোলাল শক্তি, তবে বাপের কথা শুনে বাণীকে নিয়ে কামরা থেকে

বেরিয়ে যেতে দেরি করল না। ভাই-বোন বেরিয়ে যেতে ডাইনিং রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন তারিক রহমান, ফিরে এসে বোনের হুইলচেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন। 'কি ঘটছে বলো তো, মেহের আপা?'

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছতে শুরু করলেন মেহের আপা। মনে মনেই বলি, ঢং! এমন ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদতে শুরু করলেন যে দেখে আমার গা জ্বলে গেল। বললেন, 'মনে বড় আঘাত পেলাম রে, তারিক। তোর ছেলেমেয়েদের আমি এত ভালবাসি, ওরা যেন আমার নিজেরই সন্তান, অথচ আমাকে বাইরের লোকের সামনে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে ওরা···বিশেষ করে বাণীটা। কি জানি কার মত হয়েছে, আমি ওর দুচোখের বিষ। সবার জন্যে এত করি আমি, কিন্তু কোন প্রতিদান নেই···।'

'মেহের আপা, মেহের আপা···,' আদর করে বোনের গলা জড়িয়ে ধরলেন তারিক রহমান, হাসছেন। 'আমরা সবাই তোমার প্রতি সাংঘাতিক কৃতজ্ঞ। কে না জানে, তুমি না থাকলে এ-বাড়িতে সংসার বলে কিছু থাকত না!' আমার দিকে তাকালেন উনি। 'জানেন, শিমুল, মেহের আপা আমাকে, আমার বাচ্চাদের এত ভালবাসে, ঢাকায় নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও সব ফেলে চলে এসেছে। সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিয়েছে সেই শয়···' হঠাৎ থেমে গেলেন।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝেছি, তারিক···তারিক ভাই!'

কাঁদতে কাঁদতেই আমার দিকে একবার কটমট করে তাকালেন মেহের আপা। ভাবলাম, ভস্ম হয়ে যাই আর কি!

নিজেকে সামলে নিয়ে বোনের দিকে তাকালেন তারিক রহমান। 'শোনো, আপা,' হাসতে হাসতে বললেন। 'শিমুল আসার পর তোমার কাজ অর্ধেক হাল্কা হয়ে গেছে। আমি জানি, বাণী আর শক্তি তোমার ওপর সত্যি অত্যাচার করে। এখন থেকে তুমি তোমার স্বাস্থ্য আর নিজের ভাল-মন্দ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, কেমন? বাচ্চাদের সব দায়িত্ব শিমুলের।'

ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে তারিক রহমানের পা ছুঁয়ে সালাম করি। মেহের আপা অবশ্যই বুঝতে পারলেন, তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলো।

প্রায় দেড় মাস পর, একদিন সন্ধেবেলা, পড়ার ঘরে আমার খাবার দিয়ে গেল সামিনা। বাড়িতে আজ একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছেন মেহের আপা। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এই ভয়ে খিদে না থাকলেও খেয়ে নিলাম, তারপর তাজা বাতাসে খানিক হাঁটার জন্যে বেরিয়ে এলাম বাগানে। বাগানে বেড়ানোটা আমার প্রায় রোজকার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

লেবু গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাঁক ঘুরতে যাব, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়িয়েও কোন লাভ হলো না, অচেনা এক ভদ্রলোকের সাথে ধাক্কা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে ক্ষমা চাইলাম, 'দুঃ-দুঃখিত!' যদিও, ধাক্কাটার জন্যে আমি দায়ী নই।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি ভদ্রলোকের দিকে। লম্বা, সরু একটা পাইপে আটকে সিগারেট খাচ্ছেন। বয়েস হবে ত্রিশের মত, স্যুট পরে আছেন, চেহারায় চালাক-চতুর ভাব, আমার বিশেষ পছন্দ হলো না। সবচেয়ে খারাপ লাগল তাঁর দৃষ্টি। নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছেন, খুঁটিয়ে দেখছেন আমাকে। বুঝতে পারলাম, সঙ্কোচ বা ভব্যতার ধার ধারেন না। 'বুঝলাম দুঃখিত, কিন্তু তোমার পরিচয়টা কি বলো তো?'

'আমি বাণী আর শক্তিকে পড়াই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। নতুন টিচার। কি আশ্চর্য, তুমি নিজেই তো দেখছি একটা খুকী, টিচার হলে কি করে?' লক্ষ করলাম, আধ বোজা চোখে বারবার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখছেন। শুধু যে অস্বস্তিকর তা নয়, আমার ভয় ভয় করতে লাগল। 'খুকী, তবে সুন্দরী!'

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে ভাবছি কি বলব। সন্দেহ হলো, ধাক্কাটা দুর্ঘটনা না-ও হতে পারে।

তারপর নিজেই উনি পরিচয় দিলেন, 'আমি জহির, ডাক্তার জহিরুদ্দিন সরকার, এ-বাড়ির ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। তারচেয়ে বড় পরিচয়, আমি মেহের আপার একজন ভক্ত।'

অবাকই হলাম আমি। চেহারায় কোনরকম বৈশিষ্ট্য নেই, এমনকি ভদ্রতার ছাপও নেই, এমন লোক ডাক্তার হয় কি করে? মেহের আপার মুখে তার নাম আগেই আমি শুনেছি, শুনেছি অল্প বয়েসী ডাক্তার হিসেবে যথেষ্ট ভাল রোজগার করেন ভদ্রলোক। তার বেশিরভাগ পেশেন্টই মহিলা, বলাই বাহুল্য তারা সবাই ধনী পরিবারের কর্ত্রী বা কন্যা।

'এই পাহাড়ের নিচের রাস্তাতেই, ওদিকের একটা দোতলা বাড়িতে থাকি আমি,' বললেন জহির ডাক্তার। 'ওটা আমার নিজেরই বাড়ি।'

'ও, আচ্ছা,' মৃদুকণ্ঠে বললাম।

'আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। অতিথিদের আসার কথা সাড়ে আটটায়, ডিনার শুরু হবে ন'টায়। চলো, চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখি,' প্রস্তাব দিলেন তিনি। 'এ-বাড়ির সুইমিং পুলটা দেখোনি বোধহয়। জায়গাটা বেশ নির্জন, চাঁদের আলোয় দারুণ লাগবে।'

'আপনি যান, আমি ভেতরে যাব, কাজ আছে।'

'সারাটা দিন রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, বুঝলে। আমার বেশিরভাগ পেশেন্ট আবার বয়স্কা, সবারই ভয় এই বুঝি মরে যাবে। বড় বিরক্তিকর পেশা, বুঝলে।'

'এতই যদি বিরক্তিকর, ছেড়ে দিলেই পারেন!' একটু কঠিন সুরেই বললাম, কিন্তু অপমানটা গায়ে মাখলেন না।

বললেন, 'ছাড়া যায় না টাকার জন্যে, বুঝলে খুকী। প্রচুর আয় করি আমি।'

পালাবার একটা উপায় হবে ভেবে একটু নরম হলাম, সামান্য হেসে বললাম, 'আমাকে খুকী বলবেন না। পরে আপনার সাথে কথা বলব, কেমন? এখন যাই।' উনি আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'ডিনার শুরু হতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি, তুমি আমাকে একা ফেলে পালালে সময়টা কাটাই কিভাবে? আমি বাঘ না ভাল্লুক যে এত ভয় পাচ্ছ?'

নার্ভাস বোধ করলাম। ভাবলাম, এ-বাড়ির ডাক্তার যখন, রূঢ় আচরণ করাটা উচিত হবে না। অগত্যা তাঁর সাথে হাঁটতে শুরু করলাম।

দম নেয়ার ফুরসত নেই, একনাগাড়ে কথা বলে চলেছেন ডাক্তার জহির। 'ভাগ্য ভাল যে আমার অনুপস্থিতিতে মেহের আপার অসুখটা বাড়েনি!'

'ওঁর অসুখটা কি?' শান্ত গলায় জানতে চাইলাম আমি।

'মেহের আপা না একদম ছেলেমানুষ! ইচ্ছে করলে হুইলচেয়ার ছাড়াও চলাফেরা করতে পারেন, কিন্তু চেষ্টা করতে রাজি নন।'

'আপনি ডাক্তার, আপনার উচিত তাঁকে বোঝানো।'

'তুমি এখনও সত্যি ছোট, শিমুল,' ডাক্তার জহির আমাকে আদর করার সুরে বললেন। 'মেহের আপাকে সুস্থ বলা মানে তাঁর সবচেয়ে বড় আনন্দটা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা। চেয়ার আর অসুস্থতা, দুটোকেই তিনি অসম্ভব ভালবাসেন। এ-সব তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলে, বাঁচবেন কি নিয়ে? কেড়ে নেয়াটা আমার তরফ থেকে নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে না? অনেক দিন চিন্তা-ভাবনা করে আমিই তো ইলেকট্রিক চেয়ারটা কিনিয়ে দিয়েছি।' কথা শেষ করে হেসে উঠলেন ডাক্তার।

ভদ্রলোককে আমার আরও খারাপ লাগল।

এরপর তিনি তারিক রহমানের কথা তুললেন। 'গান গেয়ে গোটা দেশটাকে মাতিয়ে রেখেছে। মানুষ হিসেবেও খুব ভাল। ভারি সরল। কিন্তু আমাদের দলের নয়, সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ।' চাপা হাসি শুনলাম, মনে হলো হাসিটার গোপন কি যেন একটা অর্থ আছে। 'উদাসীন আর কি বাড়ির কোন খবরই রাখে না।'

এক অর্থে তাঁর সাথে একমত হলাম বটে, তবু জানতে চাইলাম, 'কেন, এ-কথা কেন বলছেন? এ-বাড়িতে এমন কি ঘটছে যা ওঁর জানা উচিত অথচ জানেন না?'

হোল্ডারে সিগারেট ভরার জন্যে দাঁড়ালেন জহির ডাক্তার। তাঁর ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল, বুঝলাম হাসছেন। 'আরে, বলো কি! ওর অজ্ঞাতে কত কি ঘটে যাচ্ছে এখানে!'

'যেমন?'

এভাবেই, আলোচনার সূত্র ধরে, হঠাৎ উঠে পড়ল শারমিন সুলতানার প্রসঙ্গ। 'তারিক রহমানের স্ত্রীকে যদি দেখতে তুমি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকালেন ডাক্তার জহির। 'সত্যি! ভারি ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র ছিল বটে। আহ্, সু-ন্দরী কাকে বলে! একটু হয়তো বেশি ধীর, বা বলা যায় চাপা স্বভাবের। মানসিক দিকটা হয়তো একটু জটিল ছিল। কিন্তু সু-ন্দরী!' আঙুলের ডগা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমো খেলেন তিনি, অন্তত সেরকমই সন্দেহ হলো আমার, দেখে বিতৃষ্ণায় ঘিন ঘিন করে উঠল গা। 'তারিক রহমান পাগলের মত ভালবাসত বউকে। আমরা সবাই।'

আমি কোন কথা বললাম না।

'তুমি ওর কথা শোনোনি? ওরা তোমাকে বলেনি কিছু?'

'না। এ-বাড়িতে তার কথা কেউ তোলে না।'

হাসিখুশি ভাবটা অদৃশ্য হলো চেহারা থেকে, বিষণ্ন দেখাল ডাক্তার জহিরকে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ব্যাপারটা সত্যি মর্মান্তিক ছিল।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'শারমিন গাড়ি চালাতে জানত বটে, আমাকে নিয়েও চালিয়েছে, কিন্তু রাঙ্গামাটির দুর্গম পথে গাড়ি চালাবার মত পাকা ড্রাইভার ছিল না সে। পরে জানা গেছে, সে নাকি ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল। পাহাড় থেকে পড়ার সাথে সাথে মারা যায়।'

শিউরে উঠলাম আমি। শারমিন সুলতানার ছবিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। হলঘরে ঢুকলেই পরস্পরকে দেখি আমরা। তাকে আমি বলি, তুমি কত সুন্দর। আমার ধারণা, শারমিন সুলতানাও আমার সাথে কথা বলে। বা বলতে চায়। তবে তার কথা আমি বুঝতে পারি না। সে তো চলে গেছেই, তারিক ভাইয়ের হাসি আর আনন্দটুকুও কেড়ে নিয়ে গেছে। 'থাক,' বললাম আমি। 'এ-বিষয়ে আলাপ করার দরকার নেই।'

'আমি জানি, তোমাকে বলে দেয়া হয়েছে বাচ্চাদের সামনে ওর কথা তোলা যাবে না, ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এর মধ্যে কোন রহস্য যদি থাকেই, ওর ছবি কেন রাখা হয়েছে বাড়িতে?' ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম কথাটা, আসলে আমার কৌতূহলেরই জয় হলো।

'মেহের আপা খুবই চান ছবিটা হলঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হোক, কিন্তু তারিক ওটা কাউকে ছুঁতে দেবে না। সে অন্তত শারমিনের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে ফেলতে চায় না।'

'স্মৃতি মুছে ফেলার প্রশ্ন ওঠে কেন? ব্যাপারটা আমি বুঝি না। দুর্ঘটনা তো মর্মান্তিক হতেই পারে, তাই বলে স্ত্রী ও মায়ের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে?'

'ওরা দু'জন বড় আজব জুটি ছিল। আমার চোখে অদ্ভুত সব জিনিস ধরা পড়েছে··· হাউজ ফিজিশিয়ান হওয়ায় সুযোগটা পাই আমি। মাথার ব্যথাটা তার শক্ত একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার চিকিৎসায় কিছুটা ভাল হয়েছিল, সেই থেকে আমাদের মধ্যে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও জন্মায়। খুব বিশ্বাস করত আমাকে, নির্ভরও করত। স্বামী হিসেবে খুব একটা সময় দিতে পারত না তারিক···।'

হঠাৎ তারিক ভাইয়ের পক্ষ নেয়ার একটা ঝোঁক চাপল আমার। 'তবে স্ত্রীকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। সবার মুখেই শুনি, দুর্ঘটনার পর সম্পূর্ণ বদলে গেছেন উনি।'

'কথাটা সত্যি, তবে তারিক খুব জেলাস ফিল করত। সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী সন্দেহপ্রবণ হলে স্ত্রী বেচারীকেই ভুগতে হয়, ঠিক না? ঈর্ষা বা সন্দেহ সাংঘাতিক জিনিস, আরও সাংঘাতিক যাকে তুমি ভালবাস তার ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখা। সন্দেহপ্রবণ স্বামীর মনে এ-প্রশ্ন না এসে পারে না আমার স্ত্রী মারা গেল কিভাবে।'

ভদ্রলোক নোংরা একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন। 'থাক, এ-ব্যাপারে আর কিছু আমি শুনতে চাই না।'

'মৃত্যুটা সম্পর্কেও জানতে চাও না?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার জহির। 'ব্যাপারটা আত্মহত্যা হতে পারে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিল সে।'

আমি কোন কথা বললাম না।

'ঠিক আছে, থাক। পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভই বা কি। কেউ যখন চায় না, ব্যাপারটা অমীমাংসিতই থাকুক।'

'আমাকে এবার বাড়ির ভেতর যেতে হবে,' ঠাণ্ডা সুরে বললাম আমি।

'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা। তোমাকে যা বললাম, এ-সব যেন দু'কান না হয়।'

'পরচর্চা আমি পছন্দ করি না,' বললাম।

'কিসের পরচর্চা, বলো চরিত্র বিশ্লেষণ,' হেসে উঠে বললেন ডাক্তার জহির। 'শারমিন সুলতানা বড় অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে ছিল। তবে গোটা ব্যাপারটায় মেহের আপার ভূমিকা কি ছিল, আমি তা জানি। শারমিনকে ভাইয়ের মতই সন্দেহ করতেন উনি, ঈর্ষা করতেন, তবে সেটা অন্য কারণে। তারিক শারমিনকে ভালবাসত, এটা তিনি একদমই সহ্য করতে পারতেন না।'

এ-সব কথা শোনাও অন্যায়। বাগান থেকে হনহন করে বেরিয়ে এলাম, বাড়িতে ঢুকে সোজা লুকিয়ে পড়লাম নিজের ঘরে। বিছানায় উঠলাম একটা উপন্যাস নিয়ে.

বাগানে খানিক আগে যা শুনেছি সব ভুলে যেতে চাই। বিশেষ করে তারিক ভাইয়ের চরিত্রে কালো ছাপ পড়ে এমন কিছু শুনতে বা মনে রাখতে চাই না।

কিন্তু খানিক পরই উপলব্ধি করলাম, কাজটা প্রায় অসম্ভব। ডাক্তারের কথাগুলো বারবার ফিরে আসছে মনে। শারমিন সুলতানার মৃত্যু সম্পর্কে তিনি আমাকে যা বলেছেন তা একটা বিষবৃক্ষের মত আমার ভেতর শেকড় ছড়াতে শুরু করেছে। এই বৃক্ষ থেকে যে বিষাক্ত ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না, বেশ বুঝতে পারছি।

আরও প্রায় তিন হপ্তা কেটে গেল। ইতিমধ্যে তারিক ভাই খুব কমই চট্টগ্রামে এসেছেন, বেশিরভাগ সময়ই আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা নিয়ে ঢাকায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় ওঁকে। ওঁর সেক্রেটারি ও ম্যানেজার, দু'জনেই একবার করে বিলাসভবনে এসেছিলেন। দু'জনেই প্রৌঢ়, উচ্চশিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তি। আমার সাথে দেখা করে দু'জনেই তাঁরা জানতে চেয়েছেন, কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। বলেছেন, কোন সমস্যা থাকলে তারা তারিক রহমানকে জানাবেন। হাসিমুখে জবাব দিয়েছি, কোন সমস্যা নেই।

সমস্যা নেই, আবার আছেও। বাণী যতই কান্নাকাটি করুক, ডাইনিংরুমে আমাকে খেতে ডাকা হয় না, খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয় পড়ার ঘরে। বাড়িতে কোন মেহমান এলে আগেই আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়, আমি যেন তাদের সামনে না বেরুই। তারিক ভাইয়ের কিনে দেয়া কাপড়চোপড়গুলো দেখতে চাইলেন মেহের আপা, দেখার পর বললেন, 'তোমার এ-সব নিতে লজ্জা করল না?' আমি কিছু বলার আগেই চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'যা হবার হয়েছে, ভবিষ্যতে আর যেন না হয়। তারিক তো দিতে চাইবেই, তার মনটা উদার, কিন্তু তোমার নেয়া চলবে না। ঠিক আছে, জোর করলে নেবে, কিন্তু বাড়িতে এসে সব তুলে দেবে আমার হাতে।' আমি কোন কথা বলিনি।

বাড়ির চাকরবাকরদের সাথে মোটামুটি একটা সদ্ভাব গড়ে উঠেছে আমার। ওরা সবাই আমার সাথে ভাল আচরণ করে। এক শুধু সামিনা বাদে। সামিনা মেহের আপার খাস চাকরানী। তার চেহারাটা তীক্ষ্ণ, ছুঁচোর মত। আমার সন্দেহ, মেহের আপার গোয়েন্দা সে। যখনই সে পড়ার বা আমার ঘরে ঢোকে, তার বেগমসাহেবার তরফ থেকে নির্ঘাৎ একটা করে দুঃসংবাদ পেতে হবে আমাকে।

তবে লতা খুব ভাল মেয়ে, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না।

আমার দুই ছাত্র-ছাত্রীই ইতিমধ্যে লেখাপড়ায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ঢাকায় বসেও তারিক ভাই তার প্রমাণ পাচ্ছেন নিয়মিত।

দুঃখ শুধু একটাই। ওঁকে খুব কম দেখি আমি। রাতে, তারিক ভাই বাড়িতে উপস্থিত থাকলেও, ডাইনিংরুমে খাই না আমি। আর দিনের বেলা বাড়িতে খুব কম থাকেন উনি। দেখা না হলেও, দেখা হবার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি। কান পেতে থাকি, কখন ওঁর ভরাট গলা শুনতে পাব, বাণী বা শক্তিকে ডাকছেন। বেশির ভাগ সময় হঠাৎ দেখা হয়ে যায়—করিডরে বা পড়ার ঘরে। কখনও বা জানালা দিয়ে দেখি বাগানে হাঁটছেন। ওঁর দীর্ঘ, একহারা কাঠামো প্রথমবার দেখলে এখনও আমার শরীরে সুখকর একটা কাঁপুনি উঠে যায়, পুলকে অবশ হয়ে আসে সমগ্র অস্তিত্ব। মাঝে মধ্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যান, সাথে আমিও থাকি। কথা খুব একটা হয় না, তবে ওঁর সান্নিধ্য আমার জন্যে বয়ে আনে স্বর্গসুখ। মানুষটাকে দেখি আর ভাল লাগার অদ্ভুত এক

আবেশে কাতর হয়ে পড়ি। এ আমার গোপন অনুভূতি, কেউ কোনদিন জানবে না। এই দুর্লভ মুহূর্তগুলো জীবনের অমূল্য সঞ্চয় বলে মনে হয়। একবার বেড়িয়ে আসার পর দু'তিন হপ্তা একটা ঘোরের মধ্যে থাকি যেন, অবসর সময়ে প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করি আর পুলকিত হই।

আমার প্রিয় শিল্পী কেমন মানুষ, সব আমি বিস্তারিত লিখে জানাই কচিকে। কচি আমার ছোট হলেও, আমরা দু'ভাইবোন আসলে বন্ধুর মত। সে-ও আমাকে নিয়মিত চিঠি লেখে, সাবধান করে দিতে ভোলে না।

মেহের আপা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও, বিলাসভবনের অতিথিদের সাথে প্রায়ই আমার দেখা হয়ে যায়। মাঝেমধ্যেই আসেন তাঁরা। তবে বেশিরভাগই মেহের আপার বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয় কেউ নন। এরকম কয়েকজন মেহমান এসেছেন একবার, তারিক ভাই তখন বাড়িতে। হঠাৎ খবর পেলাম, সিদ্ধান্ত হয়েছে রাতের ডিনারটা বাড়িতে খাওয়া হবে না, খাওয়া হবে চীনা রেস্তোরাঁয়। রওনা হবার সময় কাউকে কিছু না বলে বাচ্চাদের সাথে আমাকেও তিনি গাড়িতে তুলে নিলেন। পরে অবশ্য মেহের আপা জানতে চেয়েছেন, আমি কেন গেলাম? আমি জবাব দিয়েছি, প্রশ্নটা আপনার ভাইকে জিজ্ঞেস করবেন।

আরেকদিন সিদ্ধান্ত হলো, দুপুরের খাওয়াটা হবে বনে, অর্থাৎ বনভোজনে যাবে সবাই। এবার আগে থেকেই সতর্ক হলেন মেহের আপা। আমাকে আড়ালে ডেকে বলে দিলেন, 'তারিক বললেও তুমি আমাদের সাথে যাবে না। এটা নেহাতই পারিবারিক পিকনিক, গেলে বিব্রত বোধ করবে তুমি।' অপমানটা মুখ বুজে সহ্য করলাম, কিছু বললাম না। কিন্তু যাবার সময় মেহের আপা নিজেই সামিনাকে দিয়ে আমাকে ডাকতে পাঠালেন দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। তারিক ভাই বললেন, 'কি ব্যাপার, শিমুল? মেহের আপা বলছে, তোমার নাকি মাথা ব্যথা করছে? তুমি নাকি পিকনিকে যাবে না?'

'কি আশ্চর্য, আমি কি বানিয়ে বলছি তোকে? কি, শিমুল?' মহিলার আত্মবিশ্বাস বটে, তাঁর ধারণা সবার সামনে আমি তাঁর মুখোশ খুলে দেয়ার সাহস রাখি না।

জটিলতা বাড়াতে চাই না, শুধু সেজন্যেই মাথা ঝাঁকালাম। 'হ্যাঁ, আপনারা যান, তারিক ভাই—আমার মাথাটা সত্যিই ব্যথা করছে।'

'সেক্ষেত্রে পিকনিক বাদ,' বললেন তারিক ভাই। 'পরে আরেক দিন হবে।'

'সে কি! কেন?' আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

তারিক ভাই হাসলেন। 'ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় বাণী আর শক্তি দু'জনেই দ্বিতীয় হয়েছে, সেটাই ছিল পিকনিকের উপলক্ষ্য। এই কৃতিত্ব যাঁর পাওনা তিনিই যদি যেতে না পারেন, পিকনিক হয় কি করে? আজ থাক, আরেকদিন হবে।'

'এ তোর ভারি অন্যায়, তারিক,' চোখ-মুখ গরম করে বললেন মেহের আপা। 'বাচ্চারা সবাই রওনা দিয়েছে, আর তুই বলছিস কিনা পিকনিক হবে না। তোর দেখছি···।'

'বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করে দেখ, শিমুলকে ছাড়া ওরা যেতে চায় কিনা?' প্রস্তাব দিলেন তারিক ভাই, হাসছেন।

'আমরা তাহলে খাব কি?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলেন মেহের আপা। 'রান্নাবান্না

তো কিছুই করা হয়নি।'

'তুমি খাবে না, না খেয়ে থাকবে আজ,' বাপের কোল থেকে ঘোষণা করল বাণী। 'লতা বুয়াকে না খাইয়ে রাখ, এবার নিজেও একদিন না খেয়ে থাক! আব্বু আর শিমুল আন্টিকে নিয়ে আমরা পিকনিকে যাব।'

'শুনলি, শুনলি তারিক!' বিস্ফোরিত হলেন মেহের আপা। 'তোর মেয়ের কথা শুনলি?'

'ছি-ছি, আপা!' তারিক ভাই অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। 'লতাকে তোমরা না খাইয়ে রাখো? এসব কি শুনছি!'

'তুই চুপ কর, তারিক! সংসারের তুই কি বুঝিস? কাজের বেটিদের কড়া শাসনে না রাখলে…,' শুরু করলেন মেহের আপা।

তাঁকে থামিয়ে দিলেন তারিক ভাই। 'এ ভারি অন্যায়। গরীব মানুষ, দু'মুঠো খাবার পাবে বলেই তোমার বাড়িতে গাধার খাটনি খাটতে এসেছে, তাদের যদি না খাইয়ে রাখা হয়…এ আমি ভাবতেও পারি না।' বাণীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরলেন তিনি। 'ছি-ছি!'

আমিই ওঁর পথ আগলে দাঁড়ালাম, বললাম, 'না, তারিক ভাই, দাঁড়ান। সবাই যাবে বলে বেরিয়ে পড়েছে, এখন আর বাতিল করতে পারবেন না। যা হবার হয়েছে, এ নিয়ে মন খারাপ না করে যান গাড়িতে উঠুন।' পরে উপলব্ধি করেছি, রীতিমত আদেশের সুরে কথাগুলো বলেছিলাম আমি। সে অধিকার কোত্থেকে পেলাম, কে আমাকে অত সাহস জোগাল, বলতে পারব না। ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তারিক ভাই। তারপর একটাও কথা না বলে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। বাণীকে কি যেন বললেন তিনি, ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল মেয়েটা। একটু পরই লতার হাত ধরে বেরিয়ে এল সে। আমাকে কেউ কিছু বলেনি, তবে মেহের আপার গাড়ি রওনা হয়ে যাবার পরও তারিক ভাই নিজের গাড়ি ছাড়ছিলেন না। অগত্যা আমিও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। পিছনের সীটে, বাচ্চাদের আর লতার সাথে বসতে যাচ্ছি, তারিক ভাই বললেন, 'ওখানে জায়গা কোথায়, সামনে এসে বসুন।'

সেদিন নিজেকে আমার বিশ্ব বিজয়িনী বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এত সম্মান কেউ কখনও দেয়নি আমাকে।

মেহের আপাকে দেখার জন্যে হপ্তায় তিন-চারদিন আসেন ডাক্তার জহির। প্রতিবারই আমাদের পড়ার ঘরে বিনা আমন্ত্রণে হানা দেন তিনি, চেষ্টা করেন লোকজনের কুৎসা-কেলেংকারি নিয়ে গল্প জমাতে। এমন নির্লজ্জ মানুষ জীবনে আমি দেখিনি, যতক্ষণ সামনে থাকেন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকেন। একদিন তো পরিষ্কার বলে ফেললেন, 'তুমি দেখতে কিন্তু ভারি সুন্দর, আমি রীতিমত…মানে, তোমাকে সত্যি দারুণ ভাল লাগে আমার।'

'আমার লাগে না!' স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি তাঁকে। এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই মেহের আপাকে অভিযোগ করেছেন, তা না হলে তিনি আমাকে ধমক দিতেন না। একদিন মেহের আপা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'ডাক্তারকে আমরা সবাই খুব ভাল জানি, শিমুল। তাছাড়া, আমারও খুব প্রিয় মানুষ সে। বুঝি না, তাকে তুমি এত অপছন্দ করো কেন! লক্ষ করছি, তোমার একটা খারাপ স্বভাব হলো, কোন কোন

লোককে একদম সহ্য করতে পারো না, আবার কোন কোন লোককে দেখলেই আহ্লাদে ঢলে পড়।'

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না,' বললাম আমি, গা গরম হয়ে উঠল।

'লক্ষ করছি, তারিককে এড়িয়ে চলার যে হুকুমটা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তুমি সেটা মেনে চলছ না। ক'দিন আগে তার ঘরে বসে সকালে কফি খেয়েছ তুমি। দু'জনে খুব হাসাহাসিও করছিলে, কানে এল। নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে ঘটনাটা? ওর ঘর থেকে তুমি বেরুতেই করিডরে দেখা হয়ে গেল আমার সাথে।'

মনে না থাকার ঘটনা সেটা ছিল না। তারিক ভাই সেদিন ওঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে, নতুন লেখা কয়েকটা গান পড়ে শোনাবার জন্যে। ইতিমধ্যে একটা গানের সুরও তৈরি করা হয়ে গেছে। কথাগুলো যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর হয়েছে সুরটাও। সারাটা দিন গুনগুন করে গাই আমি। গানটি যে আমাকে নিয়েই লেখা!

দু'জনের মাঝখানে ছিল তুমুল বৃষ্টি
দুপুরবেলা সে এক কাণ্ড অনাসৃষ্টি।
ভেজা বাতাসে ছিল আমার লেখা গান
করুণ বিষণ্ন সুরে ব্যথা ও অভিমান।
নির্জন বারান্দায় মেয়েটি ছিল একা
দেখে মনে হলো ছবি যেন পটে আঁকা।
সাজানো বাগানে মানাবে তাকে ভাল
শান্ত ও স্নিগ্ধ, কোমল আশার আলো।

গুন গুন করি আর ভাবি, সত্যিই কি আমাকে দেখে পটে আঁকা ছবি বলে মনে হয়েছিল ওঁর? কার বাগানে, কার সাজানো বাগানে ভাল মানাবে আমাকে? কার জীবনে আমি আশার আলো ছড়াব? ভাবি আর পুলকিত হই। উপলব্ধি করি, আমার মত ভাগ্যবতী মেয়ে বাংলাদেশে আর বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। প্রখ্যাত গায়ক তারিক রহমান স্বয়ং আমাকে নিয়ে গান লিখেছেন। আমার সাথে ওঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটা ভুলে তো যানইনি, বরং চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে কলম তুলে নিয়েছেন হাতে।

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বললাম মেহের আপাকে। 'কিন্তু তারিক ভাই আমাকে এ-বাড়িতে এনেছেন, তিনি ডাকলে তাঁর মুখের ওপর বলে দেয়া সম্ভব নয় যে যাব না।'

এরপর ঈর্ষাকাতর মেহের আপা গর্জে উঠলেন, 'দেখো শিমুল, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না! তারিক বাড়িতে এলেই ওর চোখে পড়ার জন্যে বেহায়ার মত মরিয়া হয়ে ওঠো তুমি। তোমার মত সুযোগসন্ধানী মেয়েদের আমার খুব ভাল করে চেনা আছে, বুঝলে! আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই, হাত বাড়ালে মারাত্মক ভুল করবে। তারিক সুদর্শন, ওর প্রচুর সয়-সম্পত্তি ও টাকা আছে, সারা দেশে খ্যাতি আছে, এ-সব কথা গরীব ঘরের একটা সাধারণ মেয়ে হয়ে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বরং পারো যদি আরেকটু নরম আচরণ করো জহির ডাক্তারের সাথে। তোমার ব্যবহার দেখে খুবই অসন্তুষ্ট সে। আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেছে, তুমি তাকে অপছন্দ করো কেন!'

রাগে, দুঃখে, অপমানে কান্না পেল আমার। ছুটে বেরিয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে।

তিন

কার্ডটা পেয়ে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল আমার। ভাবলাম, এত সুখ আমার সইবে তো?

আজই সন্ধে সাতটায় টাউন হলে তারিক ভাইয়ের একক অনুষ্ঠান। ভগ্নীপতিকে আমার কার্ডটা দিয়ে বলে গেছেন, তিনি যেন আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসেন। একটু অভিমান হলো, কার্ডটা তিনি নিজের হাতে আমাকে দিলেন না কেন! তারপর ভাবলাম, তিনিও হয়তো আমার মত মেহের আপাকে ভয় পান।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে সত্যি আমি নাচলাম। এত আনন্দ আমি রাখি কোথায়। এ আমার কতদিনের পুরানো স্বপ্ন, প্রিয় শিল্পীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকব, তাঁর গান শুনব। স্বপ্নটা যে এভাবে সত্যি হয়ে উঠবে, কে জানত! তারপর আমি সাজতে বসলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে সাজলাম। তারপর মনে হলো, এ আমি কি পাগলামি করছি! তারিক ভাই আমার প্রিয় গায়ক, আমি ওঁর গান শুনে মুগ্ধ হতে চাই। নিজেকে ওঁর চোখের সামনে লোভনীয় করে তোলার কোন উদ্দেশ্য তো আমার থাকা উচিত নয়। ওঁকে আমার ভাল লাগে, ওঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই, এর মধ্যে কোন স্বার্থবোধ কেন থাকবে! আবার সব ধুয়ে ফেললাম। নিজের অনুষ্ঠানে ভক্তদের সারিতে মুগ্ধ একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে পাবেন আমাকে তারিক ভাই, এটাই আমার ইচ্ছে। ওঁকে নিয়ে আমি যদি কোন স্বপ্নের জাল বুনিও, সেটা চিরকাল গোপনই থাকবে—কেউ কোনদিন জানবে না, এমন কি তারিক ভাইও না।

মোরশেদ খান মেহের আপার কামরা থেকে বেরুতে দেরি করছেন দেখে একাই চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম আমি। অনুষ্ঠান শুরু হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এই সময় নিজের আসনে গিয়ে বসলাম। স্টেজে এলেন তারিক ভাই, এসেই সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। দ্বিতীয় সারির একটা চেয়ারে বসে আছি আমি, পরেছি গোলাপি শাড়ি ও ব্লাউজ, খোঁপার সাথে আটকে নিয়েছি সাদা একজোড়া গোলাপ। তারিক ভাই প্রথমেই যে গানটি গাইলেন, গানের কথাগুলো কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল আমার সাজ-পোশাকের সাথে, তিনি যেন জানতেন গোলাপি শাড়ি পরেই আমি ওঁর অনুষ্ঠানে আসব।

তিনি গাইলেন—

তাজা একটি গোলাপ তুমি, তুমি সুন্দর, তুমি অভয়
কাতর আমি, ব্যাকুল হৃদয়, জীবনভর শুধু সংশয়…

ওমা, অবাক হয়ে শুনি কি, ওঁর দ্বিতীয় গানটিও যেন আমাকে নিয়ে লেখা—

আমার বাগানে ফুটবে যদি গোলাপ হয়েই ফোট…

তারপর তিনি গাইলেন—

কতকাল একা আমি, শোকাহত ক্লান্ত উদাস…

অনুষ্ঠান শেষ হলো। তখনও জানি না অন্য একটা অনুষ্ঠান, যা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, সবেমাত্র শুরু হতে যাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছি, হল থেকে বেরিয়ে আসব, স্টেজ থেকেই আমার নাম ধরে ডাকলেন তারিক ভাই, বললেন, 'অপেক্ষা করুন।'

রাত তখন এগারোটার ওপর, আমাকে একা ছাড়তে রাজি হলেন না তারিক ভাই, তুলে নিলেন নিজের গাড়িতে। বারোটা বাজতে ক'মিনিট বাকি থাকতে বাড়ি ফিরলাম আমরা। রাস্তায় কোন কথা হয়নি, গাড়ি চালাতেই ব্যস্ত ছিলেন তারিক ভাই। ও, হ্যাঁ, লিখতে ভুলে যাচ্ছি—আমি ওঁর পাশেই বসেছিলাম। জানি কাজটা নির্লজ্জের মত হয়ে গেছে, কিন্তু নিজেকে আমি শাসন করতে পারিনি—সারাটা পথ ওঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম আমি। গাড়ি চালাতে ব্যস্ত থাকলেও, ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন তারিক ভাই। একবার শুধু আমার দিকে ফিরে বিষণ্ন একটু হেসেছেন।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মেহের আপার ঘরে আলো জ্বলছে না, দরজাও বন্ধ। শরাফত মিয়া ছাড়া চাকরবাকররাও কেউ জেগে নেই। নিজের ঘরের দিকে যাব এবার, এই সময় তারিক ভাই বললেন, 'অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সেই ছ'টার সময় ডিনার খাইয়েছে আমাকে, সে-সব অনেক আগেই হজম হয়ে গেছে। আর আপনি তো বোধহয় বিকেলের নাস্তার পর আর কিছু খাননি, তাই না? তারমানে আপনারও ভীষণ খিদে পেয়েছে, রাইট?'

লজ্জা পেয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালাম। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি খাবেন বলুন···।'

'উঁহুঁ, আমার জন্যে আপনাকে কিছু চুরি করতে হবে না। কিচেনে যদি হামলা করি, দু'জনেই করব, দোষ হলে দু'জনেরই হবে। যাবেন, রাজি আছেন?'

হেসে ফেললাম। 'এ আপনার নিজের বাড়ি, চুরি বা হামলা করতে হবে কেন!'

'বাড়ি আমার, কিন্তু সংসারটা মেহের আপার আণ্ডারে,' মনে করিয়ে দিলেন তারিক ভাই। 'জানতে পারলে নির্ঘাৎ আমার কান মলে দেবে। কিন্তু সত্যি আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আসুন, একটা চুক্তি হয়ে যাক।'

ওঁর ছেলেমানুষি দারুণ ভাল লাগছিল আমার। কত বড় শিল্পী উনি, অথচ আমার মত সামান্য একটা মেয়ের সাথে কি সরলভাবে মেলামেশা করতে পারছেন। 'কিসের চুক্তি, তারিক ভাই?' উৎসাহ দিই ওঁকে আমি।

'কিচেনে দু'জনে যাব, যা আছে পেটভরে খাব, কিন্তু,' বলেই ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন, '···কিন্তু, একদম চুপ। কাকপক্ষীও টের পাবে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আকাশ থেকে পড়বেন। রাজি?' শেষ শব্দটা উচ্চারণ করলেন ফিসফিস করে, যেন কেউ শুনে ফেলবে।

'রাজি,' আমিও বিড় বিড় করলাম। বুকের ভেতর আমার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। ওঁর পিছু পিছু অন্ধকার করিডরে বেরিয়ে এলাম। কিচেনে ঢুকে প্রথমে দরজা বন্ধ করলেন তারিক ভাই, তারপর আলো জ্বাললেন। ডাইনিংরুমে তো আছেই, কিচেনেও একটা ফ্রিজ রয়েছে, তৈরি খাবার অনেক কিছু পাওয়া গেল ভেতরে। একটা ট্রেতে সব আমি সাজালাম। আমার কানের কাছে ফিসফিস করলেন তারিক ভাই।

'এ-সব আমরা কোথায় বসে সাবাড় করব?'

'পড়ার ঘরে।'

'না,' আপত্তি করলেন তারিক ভাই; 'পড়ার ঘর থেকে মেহের আপার একটা জানালা দেখা যায়, আলো জ্বাললে দেখে ফেলতে পারে। আমার ঘরে চলুন।'

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে খেতে শুরু করলাম আমরা। তারিক ভাই আগেই বলে দিলেন, 'আপনি যতটুকু খাবেন ঠিক ততটুকু খাব আমি। আপনি কম খেলে আমাকে খিদে

নিয়ে ঘুমোতে যেতে হবে।'

এ-কথার পর স্বভাবতই পেট ভরে খেতে হলো আমাকে, ওঁকে আমি অর্ধভুক্ত থাকতে দিই কিভাবে।

'আজ কোন গানটা আপনার সবচেয়ে ভাল লাগল?' হঠাৎ জানতে চাইলেন তারিক ভাই।

'আপনার সব গানই ভাল লাগে আমার, তবে আজকের তৃতীয় গানটা অসম্ভব ভাল লাগল,' বললাম, তারপরই জানতে চাইলাম, 'আপনি শুধু দুঃখের গান লেখেন কেন, তারিক ভাই? মানুষের জীবনে কি হাসি-আনন্দও নেই?'

এক নিমেষে বদলে গেল ওর চেহারা। 'আমার জীবনে নেই,' বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। 'আপনার কথা বলুন। বাণী আর শক্তি যে রকম উন্নতি করছে, সত্যি আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখানে আপনি টিকবেন তো?'

'আপনারা যদি তাড়িয়ে না দেন, টিকব না কেন। আমি তো বেশ ভালই আছি।'

'আপনাকে তো দেখি সারাক্ষণ শুধু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত থাকেন, এটা কি ভাল থাকার লক্ষণ হলো?' এই প্রথম সরাসরি আমার দিকে তাকালেন তারিক ভাই, খুঁটিয়ে কি যেন খুঁজলেন আমার চেহারায়। আমার উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না, আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন, 'স্টেজে উঠে দেখি রঙ মেখে সং সেজে বসে আছে সবাই—শুধু একটি মেয়ে পরেছে সাধারণ একটা গোলাপি শাড়ি ও ব্লাউজ, কোন মেকআপই ব্যবহার করেনি। তাই প্রথমেই তার ওপর চোখ পড়ল।'

'ধন্যবা…,' শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, এমন জড়োসড়ো হয়ে উঠলাম যে শব্দটা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না, তারপর তারিক ভাইই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'হাসি-আনন্দ কি আপনার জীবনেও আছে, শিমুল?'

বললাম, 'কেন, হাসি-আনন্দ থাকবে না কেন! এই যে আপনার সাথে বসে রাত দুপুরে পিকনিক করছি, এটাকে আপনি আনন্দ বলবেন না? আমি তো জীবনে কোনদিন ভুলব না আজকের কথা… ।'

'কি জানো, আমি অনেক বদলে গেছি। আমার ভেতর একটা অদ্ভুত ছেলেমানুষি আছে, মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ভরা…শারমিন ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল। এরকম রাত দুপুরে প্রায়ই ওকে নিয়ে কিচেনে হানা দিতাম, কখনও বাগানে গিয়ে ঢুকতাম…ও কিন্তু বিরক্ত হত না। আসলে শারমিন নেই তো, মনটা একদম মরে গেছে। আজকাল এ-সব আর ভাল লাগে না। অনেক দিন পর আবার তোমাকে দেখে… ।'

দম আটকে এল আমার। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তারিক ভাই। আজই উনি নিজে থেকে স্ত্রীর নাম মুখে আনলেন। মনে মনে আশা করছি, ওঁর জীবনের অন্তত কিছু কথা আজ আমার জানা হবে। রহস্যময়ী শারমিন সুলতানা সম্পর্কে আমার কৌতূহল খানিকটা হলেও মিটবে হয়তো। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হলো, প্রসঙ্গটা তুলে নিজেই যেন বিব্রত বোধ করছেন। হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টে তিনি বললেন, 'আপনার চোখ লালচে লাগছে, এবার ঘুমিয়ে পড়া উচিত। সারাদিন ওদেরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, নিশ্চয়ই ক্লান্তবোধ করছেন। যান, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'না, আমি ক্লান্ত নই!' তাড়াতাড়ি বললাম, ওঁকে একা রেখে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে

না আমার। আরও একটু থাকি না!

হেসে ফেললেন তারিক ভাই। 'আসলে আমার ঘুম পাচ্ছে তো, ভাবলাম আপনারও পাচ্ছে।'

সোফা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। 'আপনার ঘুম পেলে আমি যাই। ছি-ছি, আগে বলবেন তো। তারিক ভাই, আপনি কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রম করেন—এতটা কি না করলেই নয়?'

মৃদু হাসলেন তারিক ভাই, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কাজ তো কেউ আমার ঘাড়ে চাপায় না। কাজের ভেতর আমি ইচ্ছে করেই ডুবে থাকি।'

'কিন্তু···কেন?'

'জীবনের একটা অধ্যায় আমি ভুলে যেতে চাই···,' থামলেন তারিক ভাই, তারপর সোফা ছেড়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় বইছে, তারিক ভাইয়ের ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এলাম আমি। সিঁড়ির আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল, তারপরই আবার নিভে গেল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করছে মেহের আপার খাস চাকরানী সামিনা। তারমানে আমাকে তারিক ভাইয়ের কামরা থেকে বেরুতে দেখেছে সে। ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছি, মেহের আপা আমাকে ডেকে পাঠালেন। ডাকতে এল সামিনা, তার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে, চোখ দুটোও। যখনই কোন খারাপ খবর আনে সে, চেহারাটা এরকম করে রাখে। দেরি না করে মেহের আপার কামরায় চলে এলাম। দেখি বিছানায় আধশোয়া হয়ে রয়েছেন তিনি, গায়ের ওপর একটা চাদর। চোখাচোখি হতে মৃদু একটু হাসলাম আমি, স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে। মেহের আপা হাসলেন তো না-ই, আক্রমণটা সরাসরি শুরু করলেন।

'শুনলাম কাল রাতে তারিকের সাথে একই গাড়িতে হাওয়া খেতে খেতে বাড়ি ফিরেছ তুমি, সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, তারিক ভাই আমাকে একটা লিফট দিয়েছেন।'

'আরও শুনলাম ওর ঘরে তুমি রাত দুটো পর্যন্ত আড্ডা মেরেছ, ঠিক?'

'রাত দুটো পর্যন্ত নয়, তবে কিছুক্ষণ ছিলাম।'

'দু'জনে নাকি একসাথে খাওয়াদাওয়াও করেছ, সত্যি?'

'হ্যাঁ, তারিক ভাইয়ের খিদে পেয়েছিল···।'

'আমি জানতে চাই, আসলে তোমার উদ্দেশ্যটা কি? কি চাও তুমি?'

'মানে? কি বলতে চান আপনি?'

'তুমি নেহাতই অনভিজ্ঞ একটা কচি খুকী, কাজেই তোমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে আমার একটা দায়িত্ববোধ আছে। সেজন্যেই আমাকে দেখতে হবে, তুমি নিজের কোন ক্ষতি করে ফেলছ কিনা।'

'আপনার ভাইয়ের সাথে কিছুক্ষণ ছিলাম বলে কি, আপনার ধারণা, আমার বিপদ হতে পারত? কি ভাবছেন পরিষ্কার করে বলুন।'

রাগে লালচে হয়ে উঠলেন মেহের আপা। 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, চোখ রাঙিয়ে

কথা বলো আমার সাথে!'

'অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনার ইঙ্গিতটা অত্যন্ত নোংরা বলে মনে হয়েছে আমার।'

চাপা স্বরে গর্জে উঠলেন মেহের আপা। 'তুমি একটা নষ্টা মেয়ে! আজই তোমাকে আমি এ-বাড়ি থেকে বিদায় করব! যাও, বেরোও, এখুনি বেরোও!'

মেহের আপার কথার ওপর কথা বলবে, এমন কেউ এ-বাড়িতে নেই। এমন কি তারিক ভাইকেও দেখেছি বোনের মন যুগিয়ে চলেন। কিন্তু আমি আর তারিক ভাইকে দেখতে পাব না, এই আশঙ্কাটা আমাকে মরিয়া করে তুলল। বললাম, 'অপরাধ করবেন আপনি, আর শাস্তি পেতে হবে আমাকে, এটা তো মেনে নিতে পারব না। কাল রাতে যা যা ঘটেছে, তার জন্যে কোনভাবেই আমাকে দায়ী করা যায় না। বিশ্বাস না হয়, তারিক ভাইকে ডেকে আনি, ওঁকেই আপনি জিজ্ঞেস করুন। আরেকটা কথা। এ-বাড়িতে আমাকে তারিক ভাই এনেছেন, আমি শুধু ওঁর কথায় চলে যেতে পারি। আর যেতেই যদি হয়, যাবার আগে ওঁকে অন্তত একটা কথা না বলে যাব না আমি—আপনি বলেছেন, ওঁর ঘরে আমি যাওয়ায় আমার ক্ষতি হতে পারত।' একটু থেমে আবার বললাম, 'যাই, তারিক ভাইকে ডেকে আনি।'

'থাম, দাঁড়াও!' বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসলেন মেহের আপা। 'তারিককে কেন টানাটানি করছ? বলছ, কাল রাতে যা ঘটেছে তার জন্যে তুমি দায়ী নও?'

'কেন আমি দায়ী হব? আপনার ভাই আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছেন, তিনিই বললেন যে খিদে পেয়েছে··· ।'

'বেশ, বুঝলাম, তারিকই দায়ী, কিন্তু তুমি কি মনে করে···,' সুরটা আগের চেয়ে অনেক নরম মেহের আপার। বুঝলাম, ওষুধে কাজ হয়েছে।

'আপনি চাইলে এই মুহূর্তে চলে যাব আমি,' বললাম। 'তবে তারিক ভাইকে সব ঘটনা জানাতে হবে।'

'থাক, তার দরকার নেই। তারিকের মনে এমনিতেই শান্তি নেই, তার অশান্তি আমি কাউকে বাড়াতে দেব না। এবারের মত সব আমি ভুলে যেতে রাজি আছি, তবে আর যেন কখনও এ-ধরনের দৃষ্টিকটু ব্যাপার না ঘটে··· ।'

'আমাকে তাহলে আপনি থাকতে বলছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'তারিক ভাইকে তাহলে কিছু জানাব না?'

'না-না, ওকে এ-সব মেয়েলি ব্যাপারে জড়াবে কেন! রাগের মাথায় দু'কথা যদি বলেই থাকি, ভুলে যেয়ো তুমি, কেমন? আসলে হাঁটাচলা করতে পারি না তো, মেজাজটা এমনিতেই চড়ে থাকে···!' আশ্চর্য, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মেহের আপা। ভাবলাম, তাহলে অভিনয়ও তুমি কম জানো না! স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

দু'দিন পরই ঢাকায় ফিরে গেলেন তারিক ভাই। মনটা খারাপ হয়ে গেল, কারণ প্রায় একমাস ওঁকে আর আমি দেখতে পাব না। একটা সাংস্কৃতিক দলের সাথে সরকারী সফরে নেপালে যাবেন উনি।

তারিক ভাইও গেলেন, আমরাও জিনিস-পত্র গোছগাছ করে রওনা হবার প্রস্তুতি

নিলাম। তারিক ভাইয়ের দেশের বাড়ি ঈদগাঁও, কক্সবাজারের কাছাকাছি। আগেই ঠিক হয়ে আছে, সবাইকে নিয়ে দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন মেহের আপা। ছেলেমেয়েরা যাবে, কাজেই আমাকেও যেতে হবে ওদের সাথে। মেহের আপা জানালেন, আমাদের সাথে ডাক্তার জহিরও ঈদগাঁওয়ে যাচ্ছেন। কারণ হিসেবে বললেন, 'ডাক্তার আমার অসম্ভব ভক্ত কিনা। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না শুনে নিজে থেকেই যেতে চাইছে।'

ডাক্তারকে আমি যে শুধু পছন্দ করি না তা নয়, তাঁকে আমি ভীষণ ভয়ও পাই। কচি চট্টগ্রামে আমার সাথে দেখা করতে আসছে, এ-কথা বলে ওদের সাথে না যাওয়ার একটা অজুহাত সৃষ্টি করতে চাইলাম আমি, কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। মেহের আপা বললেন, 'একদিনের জন্যে তুমি একা ফিরে এসো, ঈদগাঁও তো আর বেশি দূরে নয়।'

অগত্যা আমাকেও যেতে হলো ওদের সাথে।

ওঁদের দেশের বাড়িটা সাগরের কাছাকাছি। চারদিকে বন-জঙ্গল, মাটির টিলা, মাঝখানে তিনটে বিশাল চারচালা। প্রচুর খেত আছে ওঁদের, গবাদি পশুও অনেক। বিশাল সম্পত্তি, কিন্তু ভোগ করার কেউ নেই। দেখাশোনা করে আত্মীয়স্বজনরা, সারা বছরের আয় থেকে কিছু তারিক ভাই ও মেহের আপা পান। সাগরের তীরে রোজই আমরা বেড়াতে গেলাম, বন-জঙ্গলেও ঘুরলাম, ফলে রোদ লেগে হাত ও মুখের চামড়া পুড়ে গেল আমার। দিনগুলো বেশ ভালই কাটছে, দুঃখ শুধু একটাই যে তারিক ভাইয়ের কোন খবর পাচ্ছি না। কাউকে যে ওঁর কথা জিজ্ঞেস করব, অত সাহস আমার নেই। তবে নেপাল থেকে চিঠি আসছে ওঁর, সবগুলোই বাণী আর শক্তিকে লেখা। মেহের আপাকেও লেখেন তিনি। শক্তিকে লেখা একটা চিঠিতে আমার কথাও একবার উল্লেখ করলেন। সমস্যা সৃষ্টি করল ওঁর ভাষা।

তারিক ভাই লিখেছেন, 'শিমুলকে আমার কুশল জানাবে। বলবে, আমি ভাল আছি, সে-ও যেন ভাল থাকে।'

'বাহ্, জবর খবর,' মন্তব্য করলেন মোরশেদ খান। আমরা সবাই তখন দুপুরবেলা খেতে বসেছি। চশমাটা নাকে ভাল করে বসিয়ে আমার দিকে ফিরে হাসলেন। 'ভদ্র বটেন শ্যালক প্রবর!'

চিঠিটা নিঃশব্দে পড়লেন মেহের আপা, তারপর ফিরিয়ে দিলেন শক্তিকে। একটা কথাও বললেন না। যদিও পরিবেশটা হয়ে উঠল উত্তেজনায় টান টান। কারণটা আমার জানা নেই, রীতিমত রহস্যময়ই বলব, সেদিন তর্কবিতর্কের পর আমার সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করছেন মেহের আপা। দেশের বাড়িতে আসার পর থেকে না হেসে আমার সাথে কথা বলেন না। খেতে খেতেই হাতব্যাগটা টেনে নিলেন তিনি, ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করলেন। আমার দিকে তাকালেন না, কথা বললেন ডাক্তার জহিরকে উদ্দেশ্য করে। 'গোপন একটা ব্যাপার, তোমাকে না জানালে পেট ফুলে মারা যাব আমি, জহির। তোমার মোরশেদ ভাই তো শুনে আনন্দে নাচতে শুরু করেছিল। দেখা যাক তোমার কি প্রতিক্রিয়া হয়। বাংলাদেশের সেরা সুন্দরীদের একজন, তাকে তুমি চেন, বিলাসভবনে দেখেছ, বলো তো কে সে, কি তার নাম?'

'সেরা সুন্দরীদের একজন…,' স্মরণ করার চেষ্টা করছেন ডাক্তার জহির। '…আমি তাকে দেখেছি…!'

'শুধু দেখোনি, তুমি তার চিকিৎসাও করেছ!' মেহের আপার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

'দু'একটা ক্লু দিই, দেখো মনে পড়ে কিনা। তার স্বামী মারা গেছে, বছর দুয়েক আগে, ছোট একটা মেয়ে আছে··· ।'

'ইউরেকা!' চিৎকার করলেন ডাক্তার জহির। 'আপনি রীনা চৌধুরীর কথা বলছেন! ওর মেয়েটির নাম পাপিয়া, বাণীর বয়েসীই হবে। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের সেরা সুন্দরীদের একজন সে। তো কি হয়েছে, মেহের আপা?'

'রীনার স্বামী আশরাফ ছিল তারিকের বন্ধু। স্বামী মারা যাওয়ায় রীনা এখন আবার মুক্ত। কত আর বয়েস হবে ওর, বড় জোর আঠাশ কি উনত্রিশ। বাপের একমাত্র মেয়ে, স্বামীও রেখে গেছে বিশাল সম্পত্তি। যেমন ধনী, তেমনি সুন্দরী। আসল কথা হলো, ওকে আমার ভারি পছন্দ।'

'আপনার হাতে ওটা কার চিঠি, মেহের আপা?' জানতে চাইলেন জহির ডাক্তার।

'এই চিঠির প্রসঙ্গেই তো আসছি,' বললেন মেহের আপা, আমার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছেন না। 'কাকতালীয়, নাকি পরিকল্পিত, খোদাই জানেন, তারিক নেপালে গান গাইতে গেছে, আর ঠিক এই সময় মেয়েকে নিয়ে আমাদের রীনাও ওখানে বেড়াতে গেছে। প্রায় রোজই দেখা হচ্ছে ওদের সাথে। তারিক লিখেছে, আগের চেয়েও নাকি সুন্দরী হয়েছে রীনা। ওর গানেরও খুব ভক্ত সে। তোমরা তো জানোই, তারিক ভাই বলতে অজ্ঞান সে। নিজেও খুব ভাল গায়। ভাবছি, দু'জনের এত যখন মিল, পরস্পরকে এত ভাল লাগে, জুটি বাঁধলে ক্ষতি কি?' এতক্ষণে মেহের আপা আমার দিকে তাকালেন। 'ভাবছি, আবার যদি বিয়ে করে সুখী হতে চায় তারিক, রীনাকে বউ করে ঘরে নিয়ে আসতে অসুবিধে কোথায়?'

কারণটা জানি না, রীতিমত অসুস্থ বোধ করলাম আমি। বাচ্চাদের খাওয়া শেষ হয়েছে, এ সুযোগে ওদেরকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম মেহের আপা বলছেন, 'কথাটা বেশি চালাচালি করা উচিত হবে না, বিশেষ করে পরিবারের বাইরে যেন না ছড়ায়। তবে তারিকের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওদের মধ্যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এখানে লিখেছে, রীনাকে নিয়ে দু'দিন ডিনার খেয়েছে ও। ওর প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছে রীনা··· ।'

সেদিন আমি বুঝতে পারলাম, তারিক রহমানকে আমি ভালবাসি। ওঁর ভক্ত ছিলাম আমি, আমার প্রিয় শিল্পীকে পুজো করতাম, কিন্তু ওর সান্নিধ্যে আসার পর কখন যেন অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছি। মনে হলো, ওঁকে আমি এত ভালবাসি, এতই ভালবাসি যে একা শুধু আমারই সাজে ওঁর পাশে দাঁড়ানো, রীনা চৌধুরী বা আর কারও সে অধিকার নেই। উপলব্ধি করলাম, কঠিন একটা অসুখে পড়েছি আমি। মারা যাব এই রোগেই। ভালবাসি অথচ তা কোনদিন প্রকাশ করা যাবে না। ধীরে ধীরে আমার জীবন থেকে দূরে সরে যাবেন তারিক ভাই। রীনা নামের একটা মেয়ে দখল করে নেবে ওঁকে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে, কিছুই করতে পারব না। ব্যর্থ প্রেমের এই জ্বালা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না। তারচেয়ে যে মরণও ভাল।

দু'হপ্তা পর ঠিক হলো, দু'দিনের জন্যে বিলাসভবনে ফিরে যাব আমি। কচি জানে আমি চট্টগ্রামে আছি, ওখানেই আমার সাথে দেখা করতে আসবে সে।

চট্টগ্রামে বাস থেকে নেমে একটা স্কুটার নিয়ে সোজা চলে এলাম বিলাসভবনে। প্যাঁচানো পথ বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল স্কুটার, সাথে সাথে আবার সেই কাঁপুনিটা

শুরু হলো। আনন্দে ও উল্লাসে, রোমাঞ্চ ও পুলকে দম বন্ধ হয়ে এল আমার। গাড়ি বারান্দায় তারিক ভাইয়ের সাদা টয়োটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি, এই গাড়িটাই ঢাকায় ব্যবহার করেন তিনি। তারমানে এরইমধ্যে দেশে ফিরে এসেছেন তারিক ভাই, অপ্রত্যাশিতভাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামেও চলে এসেছেন।

'কি আশ্চর্য!' চেহারায় অসহায় ভাব, চারদিকে তাকালেন তারিক ভাই। 'আমরা বসব কোথায়?' খানিক আগে হলরুমে ওর সাথে দেখা হয়েছে আমার। দু'জন একসাথে গোটা বাড়ি চষে ফেলেছি, যেন এই প্রথমবার ঢুকেছি এখানে। সবশেষে আবার ফিরে এসেছি হলরুমে। 'এ নিশ্চয় মেহের আপার কাণ্ড, ধুলো লাগার ভয়ে সব চাদর দিয়ে মুড়ে রেখে গেছে। সন্দেহ নেই, বোনটি আমার ভারি লক্ষ্মী! কিন্তু বসব কোথায়?' হেসে উঠলেন তিনি।

ভারি লজ্জা লাগল, তাই আসল কথাটা চেপে গেলাম। মেহের আপা নন, পুরানো চাদর দিয়ে বাড়ির সমস্ত ফার্নিচার আমিই ঢেকে রেখে গিয়েছিলাম। 'বসার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়ান,' বলে কিচেন থেকে ডেকে আনলাম লতাকে। হল, ডাইনিং আর ড্রইংরুমের ফার্নিচার থেকে চাদর সরাবার পর তারিক ভাইকে বললাম, 'দিন, আপনার ঘরের চাবি দিন।'

চাবি নিয়ে তারিক ভাইয়ের কামরা দুটো পরিষ্কার করলাম, খুলে দিলাম সবগুলো জানালা। লতাকে পাঠালাম কফি বানাতে। হলরুমে ফেরার জন্যে করিডরে বেরিয়ে আসব, সামনে উদয় হলেন তারিক ভাই।

'আমার ঘরেই বসুন, হারমোনিয়াম নিয়ে,' সহাস্যে বললেন উনি। 'আজ আপনার গান শুনব আমি। তার আগে দু'কাপ কফি হলে মন্দ হত না।'

'গান গাইব? আমি?' ইচ্ছে হলো ছুটে পালাই। এত বড় শিল্পীকে আমি কি গান শোনাব! 'না, প্লীজ···আমাকে মাফ করতে হবে।'

'কেন, কারণটা কি?'

আমি দরজার ভেতর, তারিক ভাই দরজার বাইরে, আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি···আমার গলা ভাল না। আপনার সামনে গান করার সাহস আমার কোনদিন হবে না।'

'একমত হতে পারলাম না। আপনার গলার বিচার কে করবে, আপনি না অন্য লোক? আপনি যখন কথা বলেন, ভারি মিষ্টি লাগে আমার কানে।'

ওঁর কথায় হেসে উঠলাম আমি। 'আচ্ছা সে দেখা যাবে, তবে এখনি নয়।'

'বেশ, এখন নয়, তবে আজই,' শর্ত দিলেন তারিক ভাই। 'আবার কবে আপনাকে একা পাই না পাই।'

এই সময় পিছিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে হলো আমাকে, কফি নিয়ে এসেছে লতা।

বাড়ির ভেতর ঢোকার পর হলরুমেই ওঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছে। আমি পৌঁছুনোর মাত্র দু'মিনিট আগে পৌঁচেছেন উনি। আমাকে দেখেই হেসে উঠেছিলেন, বললেন, 'আরে, শিমুল, আপনি? কোত্থেকে উদয় হলেন? আপনার তো ঈদগাঁয়ে থাকার কথা!'

ওঁকে জানালাম, আমার ভাই কচি আসবে আজ, ওর সাথে দেখা করার জন্যে

দু'দিনের ছুটি নিয়েছি।

সোফায় বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি এই মুহূর্তে, জানতে চাইলাম, 'নেপাল থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে, তারিক ভাই? আপনার তো আরও এক হপ্তা পর আসার কথা ছিল।'

'আর বোলো না। আমাদের কালচারাল টিমের সব ক'জনকে ফ্লুতে ধরেছিল, এক হপ্তা আগেই ফিরে আসতে হয়েছে। ঢাকা পর্যন্ত আমি ভালই ছিলাম, কিন্তু এখানে আসার পর একটু গরম লাগছে গা।'

উদ্বেগ বোধ করলাম। 'ডাক্তার দেখালে হয় না?' ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে ওঁর কপালে একটা হাত রাখি।

হেসে উঠলেন তারিক ভাই। 'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক। ইতিমধ্যে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, আপনি তো আছেনই।'

আমি আছি! কি বলতে চান তারিক ভাই? হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি ওঁর সেবা করব? অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে।

সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তারিক ভাই, দু'চোখে ঝিকমিক করছে কৌতুক। 'শারমিন বেঁচে থাকতে এরকম অসুস্থ প্রায়ই আমি হয়ে পড়তাম। আসলে সেবা পাবার একটা ছেলেমানুষি লোভ আছে আমার।'

ওঁর দিকে তাকাতে পারছি না। খালি বাড়িতে আমি আর ওঁ শুধু। কি না কি ঘটে যায়। তারিক ভাই এরপর যা বললেন, শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'আজ কিন্তু আপনাকে সাংঘাতিক সুন্দর লাগছে। আপনার গায়ের রঙ এমন সোনালি হলো কি করে?'

চোখ বটে, সবই দেখতে পান! দেশের বাড়িতে যাবার পর রোদের মধ্যে সৈকতে হাঁটাহাঁটি করেছি, চামড়া পুড়ে গেছে, ওঁর দৃষ্টিতে সেই পোড়া চামড়া নাকি সোনালি! কথা বলতে পারব না, বুঝতে পেরে চুপ করে থাকলাম।

'তবে চুল কাটা উচিত হয়নি আপনার,' বললেন তারিক ভাই। 'উচিত হয়নি বলছি এজন্যে যে লম্বা চুলই ভাল লাগে আমার।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ দেশের বাড়িতে যাবার আগে বিউটি পারলারে গিয়ে চুল কাটিয়েছিলাম, তারিক ভাই ছোট চুল পছন্দ করেন মনে করে। হলরুমে শারমিন সুলতানার যে ছবিটা আছে, তাতে দেখেছি তার চুল কাঁধ পর্যন্ত কাটা।

'ঠিক আছে, এরপর আর কাটব না,' বলার পর বুঝলাম, ওটা আমার কণ্ঠস্বর। ইতিমধ্যে ঘেমে গেছি আমি।

'থাক এ-প্রসঙ্গ, আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, বোধহয় এক-আধটু ভয়ও পাচ্ছেন। আমার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে বলুন।'

ওরা ভাল আছে শুনে খুশি হলেন তারিক ভাই। বললেন, 'জানি, আপনি যতদিন আছেন, ওদের জন্যে আমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না।'

আমি কিছু বললাম না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিলেন তারিক ভাই। 'এ-বাড়ির পরিবেশ যে আপনার অনুকূলে নয়, তা আমি জানি। আশা করি আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন, অনেক জিনিস দেখেও না দেখার ভান করতে হয় আমাকে। তবে আমি চাই, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে

দেখলে আপনি মুখ বুজে সহ্য না করে আমাকে জানাবেন।'

'কি বলছেন! না! কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করে না…!'

হাসলেন তারিক ভাই। 'আপনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন, সেজন্যে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। এর আগে চার-পাঁচজন টিচার রাখা হয়েছে, কেউ তারা টিকতে পারেনি।'

'কচি এলে সবাই একসাথে খেতে বসব।' সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন তারিক ভাই। 'গাড়ি চালিয়ে এসেছি তো, ক্লান্ত লাগছে—গোসল করব। আপনারও বোধহয় বিশ্রাম দরকার।'

নিজের ঘরে ফিরে আসছি, করিডরে দেখা হয়ে গেল শরাফত মিয়ার সাথে। কেনাকাটা করতে বাইরে গিয়েছিল সে, এইমাত্র ফিরেছে। আমাকে দেখে বলল, 'আপা, ঢাকা থেকে আপনার একটা টেলিগ্রাম এসেছে কাল। আপনার ঘরে রেখে দিয়েছি, টেবিলের ওপর।'

টেলিগ্রাম? ঢাকা থেকে? কচি কি আসছে না? ওর কিছু হলো নাকি?

তাড়াতাড়ি তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। যা ভয় করেছি, তাই। কোন্ এক ফরেন এমব্যাসি ছবি দিয়ে সাজানো হবে, তরুণ শিল্পীদের একটা দল কাজটা পেয়েছে, দলের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে কচিকে, কাজেই চট্টগ্রাম ভ্রমণ বাতিল করতে হয়েছে তাকে।

খেতে বসে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন তারিক ভাই। 'মন খারাপ করবেন না। আগামী মাসে আপনিই বরং ঢাকা থেকে বেড়িয়ে আসুন। মেহের আপাকে বলে আপনার ছুটির ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।'

বললাম, 'সে যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। আমি ভাবছি এখনকার কথা।' রিস্টওয়াচের ওপর চোখ রাখলাম। 'সাড়ে তিনটে বাজে, ঈদগাঁর বাস বোধহয় পেতেও পারি, কি বলেন?'

প্লেট থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন তারিক ভাই। 'আপনি কি পাগল হলেন? সন্ধের পর ঈদগাঁর রাস্তায় ডাকাতি হয়। তাছাড়া একা একটা মেয়ে…অসম্ভব, আপনাকে আমি ছাড়তে পারি না। কাল সকালে আপনাকে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

তারিক ভাই আমাকে পৌঁছে দিতে চাইছেন! ভাল লাগল, আবার ভয়ও হলো। একসাথে ফিরতে দেখলে মেহের আপা আমাকে আস্ত রাখলে হয়। বললাম, 'কিন্তু আপনার না কাল সকালে ঢাকায় ফেরার কথা?'

'সিদ্ধান্ত বদলেছি,' স্মিত হেসে বললেন তারিক ভাই। 'ছেলে-মেয়েদের দেখতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া, আপনার সঙ্গটাও আশা করছি ভাল লাগবে আমার।'

আড়ষ্ট ভাবটা কোনমতে কাটিয়ে উঠতে পারছি না আমি। কিছু একটা বলা উচিত, অন্তত একটা ধন্যবাদ তো দেয়া দরকার। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। সামনে রাত, খালি বাড়িতে আমরা শুধু দু'জন। কে জানে তারিক ভাই কি ভাবছেন। কি ঘটতে পারে, সে-সম্পর্কে আমারও কোন ধারণা নেই। তবে ভয় ভয় করছে। অস্বীকার করব না, রোমাঞ্চও অনুভব করছি। ভয় করছে, তার কারণ তারিক ভাইকে আমি ভালবাসি। ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার শক্তি আমার ভেতর নেই। তিনি চাইলে নিজের সর্বনাশ করতে দ্বিধা করব বলে মনে হয় না। তবে এ-ও জানি যে ওঁর ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পণ করলে শুধু যে নিজের সর্বনাশ সাধন করা হবে তা নয়, ভালবাসাটুকুও

অপবিত্র করা হবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সাধারণ মেয়ে হিসেবে আমার ভেতর কিছু সংস্কার আছে, যে-কোন মূল্যে সেগুলো রক্ষা করার একটা প্রবণতাও আছে, কিন্তু আমার ভেতর তারিক ভাইয়ের প্রভাব এতই প্রবল যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে বলতে পারি না। এমন হতে পারে যে প্রথম ও শেষবার ওঁকে আপন করে পাবার সুযোগ আমার ছাড়তে ইচ্ছে করবে না। এ-ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই যে ওঁকে ভালবাসা আমার তরফ থেকে নেহাতই মস্ত একটা বোকামি, কারণ কোন দিক থেকেই আমি ওঁর উপযুক্ত নই। ভালবাসি, কিন্তু জানি কোনদিনই ওঁকে নিজের করে আমার পাওয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে তারিক ভাই যদি লোভ করেন, নিজেকে ওঁর হাতে তুলে দেয়ার জন্যে আমার ভেতরও হয়তো একটা ব্যাকুলতা সৃষ্টি হবে। ভালবেসে যাকে কোনদিন পাব না, তার দেয়া একটা ব্যথা ও আনন্দ যদি পাই, তা-ই বা মন্দ কি—অসুখী, ব্যর্থ জীবনে তবু একটা স্মৃতি তো থাকবে!

তারপর নিজেকে গালমন্দও করলাম—তাই বলে তুই চরিত্র হারাবি? ছি-ছি, এ-সব ভাবতে পারছিস, তোর লজ্জা করছে না? মর মুখপুড়ী, গলায় দড়ি দে!

মনে মনে তিক্ত হাসি হাসলাম। মরবই তো। যেদিন বুঝেছি ওকে আমি ভালবাসি সেদিন থেকেই জানি, এ আমার মরণ রোগ।

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো চলুন না, সন্ধেটা আজ আমরা একসাথে কাটাই,' খাওয়ার পর বললেন তারিক ভাই। গাড়ি নিয়ে পতেঙ্গা থেকে বেড়িয়ে আসি, ফেরার পথে বাইরে কোথাও রাতের খাবার খেয়ে নেব? বেইজিং আমার এক বন্ধুর রেস্তোরাঁ, দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ওখানে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমাকে পেলে খুশি হবে ওরা—যাবেন? লটারির আয়োজন আছে, ভারি সুন্দর কাটবে সময়টা।'

বললাম, 'না···।'

'কে কি ভাববে, এই তো? কেউ জানবে কেন? আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না, আপনিও কাউকে বলবেন না, ব্যস মিটে গেল। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিন, তারপর তৈরি হোন, কেমন? যদি কিছু মনে না করেন, জানতে পারি, কি পরবেন আপনি?'

চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। বললাম, 'আপনি যা বলবেন!'

'আপনি এমনিতেই আমার চেয়ে অনেক ছোট, সালোয়ার-কামিজ পরলে আরও ছোট মনে হবে—আমার মত বয়স্ক একটা লোকের সাথে মানাবে না···।'

'আপনার চেয়ে অনেক ছোট আমি? কি করে? আমার তেইশ চলছে, আগামী জুনে চব্বিশে পড়বে···।'

'আর আমার চলছে তেত্রিশ। দশ বছরের পার্থক্য।'

'দশ বছর কোন পার্থক্যই নয়।' প্রতিবাদ করলাম আমি।

'আপনার তাই ধারণা?' হেসে উঠলেন তারিক ভাই। 'শুনে খুশি হলাম।' একটা সিগারেট ধরালেন।

'এত সিগারেট খান, গলার ক্ষতি হয় না?'

'তা হয়তো হয়,' অন্যমনস্ক হয়ে উঠলেন তারিক ভাই। 'কিন্তু···।'

'কিন্তু কি?'

'আগে কিন্তু আমি সিগারেট খেতাম না,' তারিক ভাই বললেন। 'ধরলাম শারমিন মারা যাবার পর। সে আমার জীবনটাকে···,' হঠাৎ থামলেন তিনি, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আধ ঘণ্টা পর তৈরি হয়ে ডাকবেন আমাকে, কেমন?' বলে আর

দাঁড়ালেন না, ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রওনা হবার সময় সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষকে দেখলাম আমি। বাচ্চা ছেলের মত উত্তেজিত হয়ে আছেন তারিক ভাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপ ক'টা বেয়ে নিচে নামছি, উনি আমার কনুই ধরে টান দিলেন, 'জলদি, জলদি! শরাফত মিয়া বা লতা দেখে ফেললে জায়গা মত খবর পৌঁছে যাবে! ওরা দেখে ফেলার আগেই পালাতে হবে—উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন।' প্রায় ধাক্কা দিয়ে গাড়ির ভেতর তুলে দিলেন আমাকে।

সময়টা যে কিভাবে কাটল, বলতে পারব না। পতেঙ্গায় যাবার পথে কয়েকবার গাড়ি থামালেন তারিক ভাই। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ফুচকা আর চটপটি খেলাম আমরা। ঝাল খেয়ে চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল ওঁর। গাড়ি ছুটছে, অনর্গল কথা বলছেন। ওঁর ভেতর যে এত কথা জমা হয়ে আছে, আমার জানা ছিল না। তবে শুধু ভবিষ্যতের কথাই বলছেন, বর্তমান বা অতীতের কোন প্রসঙ্গ তুলছেন না। শুধু যে বিখ্যাত গায়ক তারিক রহমানের পাশে বসে আছি তা নয়, ইনি একজন মহৎপ্রাণ মানবদরদীও বটেন। ওঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল আমার। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলছেন আমাকে, চেহারায় ব্যাকুলতা; জানতে চাইছেন ওঁর এ-সব পরিকল্পনায় আমার অনুমোদন আছে কিনা, যেন আমার অনুমোদনটা তাঁর জন্যে খুব জরুরী। ওঁর প্রতিটি পরিকল্পনাই বিশাল, দীর্ঘমেয়াদী ও খরচবহুল। চট্টগ্রাম শহরে যারা বস্তিতে বাস করে তাঁদের জন্যে ঈদগাঁওয়ে একটা কলোনি বানাতে চান তারিক ভাই। কিন্তু বস্তির লোকেরা শহর ছেড়ে যেতে চাইবে না, কারণ শহরেই কাজ করে তারা। সেজন্যে কলোনির সাথেই তৈরি করা হবে মিল-কারখানা, লোকগুলো যাতে কাজ পায়। ছোট আকারের পাঁচটা শিল্পকারখানার প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করা হয়ে গেছে, ব্যাংক লোনও পাওয়া যাবে। কারখানাগুলো চালু হলে প্রায় বারো শো লোকের কাজের ব্যবস্থা হবে। এরকম আরও দশটা কারখানার প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করা হচ্ছে। কলোনিতে কি কি থাকবে তারও বিস্তারিত বিবরণ পেলাম। বয়স্কদের জন্যে বিরাট একটা স্কুল থাকবে, নিরক্ষরদের জন্যে স্কুলে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হবে। একটা প্রাইমারি ও একটা মাধ্যমিক স্কুলও থাকবে। আর থাকবে একটা টেকনিক্যাল স্কুল। কিশোর ও যুবকদের জন্যে যে-কোন একটি কারিগরি বিদ্যা অর্জন বাধ্যতামূলক করে দেয়া হবে।

বললাম, 'ওদের আমি পড়াব।'

'কি বললেন? পড়াবেন? কাদের পড়াবেন?' বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন তারিক ভাই, ওঁর কথার মাঝখানে বাধা দেয়ায় একটু বোধহয় বিরক্তই হয়েছেন।

'কলোনির গার্লস স্কুলে আমাকে একটা চাকরি দিতে হবে,' বললাম আমি।

'কিন্তু কলোনিতে গার্লস স্কুল থাকবে তা তো আমি বলিনি!'

'না, বলেননি। কিন্তু ভেবে দেখুন, যে কলোনিতে দশ পনেরো হাজার পরিবার বাস করবে সেখানে যদি একটা গার্লস স্কুল না থাকে, পরিকল্পনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে না? মেয়েরা যদি লেখাপড়া না শেখে, পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা কি দাঁড়াবে চিন্তা করে দেখেছেন?'

আমার দিকে ঝাড়া তিন সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর তারিক ভাই বললেন, 'ভাইটাল

একটা পয়েন্ট। ধন্যবাদ, শিমুল। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সত্যিই তো, গার্লস স্কুল তো না হলেই নয়। গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, দেখা যাক অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আপনাকে কো-অপ্ট করা যায় কিনা···।'

পতেঙ্গায় অনেক দেরি করে পৌঁছুলাম আমরা। কারণ রাস্তায় আরও কয়েকবার গাড়ি থামালেন তারিক ভাই। একবার একটা বাজারে ঢুকে পেয়ারা কিনলাম আমরা। তারপর এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা খেলাম। সন্ধের পর সাগরের পাশে হাঁটলাম দু'জনে পাশাপাশি। প্রবল বাতাসে আমার শাড়ির আঁচলটাকে বশে রাখতে পারছি না, দু'একবার ওঁর মুখে ঝাপটা মারল। একবার তো ওঁর গলায় প্রায় পেঁচিয়ে যাচ্ছিল। আঁচলটা ছাড়িয়ে আমার চোখে চোখ রাখলেন তারিক ভাই, হেসে উঠে বললেন, 'মনে পড়ছে, আমিই আপনাকে শাড়ি পরে আসতে বলেছি। আপনার আঁচলটা বোধহয় বাঁধতে চায় আমাকে!'

শুনে হাত-পা অবশ হয়ে এল। থরথর করে কেঁপে উঠলাম। ভাবলাম, এ কিসের লক্ষণ? কি ভাবছেন তারিক ভাই? শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছুব আমরা?

ফেরার পথে কি যে হলো আমাদের, কেউ কোন কথা বলছি না। যদিও অদ্ভুত একটা ভাল লাগার অনুভূতি আমার সমগ্র অস্তিত্বে ছড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে সময়টাকে চিরকাল ধরে রাখি।

বেইজিঙের পরিবেশ আবার আমাদেরকে হাসিখুশি উচ্ছল করে তুলল। প্রথমশ্রেণীর চাইনীজ রেস্তোরাঁ, শহরের নামকরা সব লোকজন ভিড় করেছেন আজ, বেশিরভাগই আমন্ত্রিত। অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধু তারিক রহমানকে পেয়ে রেস্তোরাঁর মালিক ইকবাল হাসান হাতে যেন চাঁদ পেলেন। আমাকেও অত্যন্ত সম্মান দেখালেন ভদ্রলোক, খাতির করে ভাল একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এক ফাঁকে তারিক ভাইকে আড়ালে ডেকে নিলেন তিনি, নিচু স্বরে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন, তারপর দু'জনেই ওঁরা হেসে উঠলেন। চট করে আমার দিকে একবার তাকালেন ইকবাল হাসান, মনে হলো আমিই ওদের আলাপের বিষয়বস্তু। লক্ষ করলাম, তারিক ভাইয়ের ঠোঁটে লাজুক একটু হাসি। তবে আমার দিকে তিনি তাকালেন না, বোধহয় চোখাচোখি হবার ভয়ে। টেবিলে ফিরে আসার পর অর্ডার দিলেন তারিক ভাই। দেখতে দেখতে টেবিল ভরে উঠল সুস্বাদু সব খাবারে, সবগুলোর নামও আমি জানি না। তারিক ভাইকে ধন্যবাদ, প্রতিটি খাবারের নাম ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলেন তিনি। এক সময় দুটো লটারির টিকেট দিয়ে গেল ওয়েটার। খাওয়া শেষ হয়েছে, রাত তখন প্রায় এগারোটা, এই সময় শুরু হলো লটারির ড্র।

মোট দশটা পুরস্কার। প্রথম পুরস্কার তিন হাজার টাকা দামের একটা ওয়ালক্লক। দ্বিতীয় পুরস্কার দু'হাজার টাকা দামের বাচ্চাদের সাইকেল। তৃতীয় পুরস্কার এক হাজার টাকা দামের খেলনা। বাকি সাতটা পুরস্কার নগদ টাকা, প্রতিটি পাঁচশো করে।

সবাই খুব হাততালি দিচ্ছে। কারণ প্রথম তিনটে পুরস্কারই পেল বাচ্চারা। একে একে ন'টা পুরস্কারই ঘোষণা করা হলো, বাকি আছে আর একটা। আর মাত্র একবার ড্র হবে। নাম্বারটা চিৎকার করে বলা হলো, সবাই আমরা শুনতে পেলাম। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না কেউ।

হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরলেন তারিক ভাই। ওঁর ছোঁয়া যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট, আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। 'শিমুল, ইয়েস বলুন! ওটা আপনার নাম্বার—দুশো ছাপ্পান্ন!'

'ইয়েস!' বললাম আমি, কিন্তু কেউ শুনতে পেল বলে মনে হলো না। পাবে কি করে, আমার গলায় আওয়াজ থাকলে তো। তখনও আমি তাকিয়ে আছি তারিক ভাইয়ের ধরা

আমার হাতটার দিকে।

'জোরে বলুন!' তাগাদা দিলেন তারিক ভাই, তারপর উনি নিজেই চিৎকার করলেন, 'ইয়েস!' দাঁড়ালেন তিনি, আমার হাতটা এখনও ধরে আছেন শক্ত করে। আমাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোলেন। কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। ইকবাল হাসান আমাদেরকে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার মুঠো থেকে টিকেটটা বের করে তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তারিক ভাই। দেখলাম, ইকবাল হাসানের কাছ থেকে পাঁচশো টাকার নোটটা নিয়ে আমার হাতের ব্যাগটা খুললেন তিনি, নোটটা ভেতরে রেখে আবার বন্ধ করলেন।

বাড়িতে ফিরে এলাম আমরা, কিন্তু সাথে সাথে ভেতরে ঢুকলাম না। আমাকে নিয়ে বাগানে ঢুকলেন তারিক ভাই। কোথাও বসলাম না, চাঁদের আলোয় ধীর পায়ে হাঁটছি দু'জনে। জীবনে যে এত মধু আছে, এত সুখ আছে, আগে কখনও বুঝিনি। এত আনন্দ লাগছে যে মনে হলো এখনি মরে যেতে পারলে ভাল হত, তাহলে এই সুখ কেউ কোনদিন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

তারপর তারিক ভাই বললেন, 'আসুন, কোথাও বসি।'

পাথরের একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসলাম আমরা।

তারিক ভাই বললেন, 'আজকের দিনটা বড় আনন্দে কাটল আমার, শিমুল। অনেক দিন পর···শারমিন মারা যাবার পর এই প্রথম আজ খুব ভাল লাগছে।'

'জানি,' বিড়বিড় করে বললাম, 'ওঁকে আপনি খুব ভালবাসতেন।'

'শুধু অসম্ভব সুন্দরী ছিল যে তা নয়, ওর মত হাসিখুশি ও সরল মেয়ে আমি আর দেখিনি।'

'ওঁর ছবি দেখে সেটা বোঝা যায়···।'

'কিন্তু শারমিন শুধু দুর্ঘটনায় মারা যায়নি, বিরাট একটা প্রশ্নও রেখে গেছে। কোন কোন রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। ভাবি, তবে কি আমার ভালবাসা মিথ্যে ছিল? দাম্পত্যজীবনে যদি বিশ্বস্ততাই না থাকল···।' হঠাৎ চুপ করে গেলেন তারিক ভাই।

ওঁর দুঃখে আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হলো সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলি, ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিই।

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারিক ভাই, বললেন, 'অতীত নিয়ে বেঁচে থাকার কোনই মানে হয় না, জানি। কিন্তু চেষ্টা করেও যে আমি তাকে ভুলতে পারি না···ভুলতে পারি না সে আমার সাথে···,' আবার চুপ করে গেলেন।

'কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারছেন না আপনি, আপনার কষ্ট হচ্ছে। থাক, তারিক ভাই। আমার শুধু খারাপ লাগছে, নিজেকে আপনি এত কষ্ট দেন কেন? যে চলে গেছে তাকে তো আর কোনদিন ফিরে পাবেন না। আপনাকে নতুন করে বাঁচতে হবে, অন্তত ছেলেমেয়ে দুটোর কথা ভেবে···।'

খানিকটা স্বাভাবিক হলেন তারিক ভাই, বললেন, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই। বিশেষ করে আপনি যতদিন আমাদের সাথে আছেন।'

ম্লান হাসলাম আমি। 'আমি কি চিরকাল থাকতে পারব, তারিক ভাই? ওরা এখনও ছোট, ওদের একজন মা দরকার। আপনি যা-ই বলুন, ওদের মায়ের অভাব মেহের আপার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, যদি না আপনি আবার···।'

বাধা দিলেন তারিক ভাই। 'না!' তীক্ষ্ণ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

খুশি হব, নাকি দুঃখিত, বুঝতে পারলাম না। মনে পড়ে গেল মেহের আপা চান, রীনা চৌধুরীর সাথে তারিক ভাইয়ের বিয়ে হোক। ওঁর সান্নিধ্য পেয়ে, ওর সাথে বেড়ানোর আনন্দে প্রসঙ্গটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম, 'শুনলাম রীনা চৌধুরী নামে এক মহিলার সাথে নেপালে দেখা হয়েছে আপনার। মহিলা নাকি অপরূপ সুন্দরী···।'

হেসে উঠলেন তারিক ভাই। 'মেহের আপার এই এক দোষ, ওর যাকে পছন্দ তার কথা বাড়িয়ে বলবেই। ভাল কথা, মেয়েকে নিয়ে রীনা বোধহয় আগামী হপ্তায় আমাদের দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। মেহের আপা আমাদের গ্রামে একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করছে, আমাকে গাইতে হবে। বোধহয় এই উপলক্ষেই রীনাকে দাওয়াত দিয়েছেন মেহের আপা। সে আবার আমার গানের খুব ভক্ত কিনা।'

'এবার ভেতরে ঢুকতে হয়, কি বলেন?'

বাগান থেকে বেরিয়ে আসছি আমরা। রাত এখন বারোটার ওপর। মাথার ওপর ঝলমলে চাঁদ। আকাশ জুড়ে মিটমিট করছে উজ্জ্বল তারা। ফুরফুরে বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে, কোথায় পা ফেলছি জানি না। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকাতে গিয়ে হোঁচট খেলাম, হাত থেকে পড়ে গেল ব্যাগটা। চারদিকে ছিটকে পড়ল ব্যাগের জিনিসগুলো। দু'জন আমরা একসাথে নিচু হলাম, জিনিসগুলো তোলার জন্যে। ঠুকে গেল দুটো মাথা।

'সর্বনাশ! ব্যথা পেলেন!'

দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেলাম দু'জন একসাথে সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে। পরমুহূর্তে দেখলাম তারিক ভাই আমাকে ধরে আছেন, ওঁর আলিঙ্গনের ভেতর আটকা পড়েছি আমি। ব্যাপারটা চোখের পলকে ঘটে গেল। আমি ব্যথা পেয়েছি ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছেন উনি, আমার কাঁধে ও মাথায় হাত রাখছেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, আবার সরিয়ে নিচ্ছেন—বারবার। মনে হলো, ওর ছোঁয়া পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি আমি। ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। ওর বুকে ঢলে পড়ছি আমি।

তারপর সরে গেলেন তারিক ভাই। ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলো তুললেন, ব্যাগে ভরে ব্যাগটা ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'কথা বলছেন না কেন? খুব লেগেছে?'

'ন্না!' কোনরকমে বললাম।

তারিক ভাইয়ের কাছে আলাদা চাবি আছে, তালা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। কেউ আমাদের জন্যে জেগে বসে নেই দেখে বিরাট স্বস্তিবোধ করলাম। হলরুমের আলো জ্বাললেন তারিক ভাই, বললেন, 'আপনি ভুলে যেতে পারেন, আমি কিন্তু ভুলিনি।' ঠোঁটে মৃদু হাসি, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমার দেবতা।

'স্পর্ধা দেখানো হয়ে যাবে, তবু এত করে যখন বলছেন, আমি গাইব। কিন্তু শর্ত হলো, আপনিও গাইবেন।'

আমাকে নিজের ঘরে এনে বসালেন তারিক ভাই। টেপ রেকর্ডার অন করলেন উনি।

প্রথমে আমি আবৃত্তি করলাম—

'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;

আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।'

তারপর হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নিজের লেখা গান ধরলাম—

'এ এক মরণনেশা
জীবনমরণ ভালবাসা
সর্বনাশা।
এ এক কঠিন সাধন
মায়ার বাঁধন,
শুধুই রোদন…'

তারপর তারিক ভাই আবৃত্তি করলেন—

'কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল তোমারে চাইঃ
বেতের ফলের মত নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়…'

আমার চোখে চোখ, তারিক ভাইয়ের বিষণ্ন দৃষ্টি আমাকে আকুল করে তুলল।

'দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ-পাখির রঙে ভরা;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপরে,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।
কড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম…'

তারপর আবার আমি গান ধরলাম, এবার তারিক ভাইয়ের লেখা। এভাবে কখন যে ভোর হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি। বাগানে জেগে উঠল সব পাখিরা, খোলা জানালা দিয়ে হিম বাতাস ঢুকল ঘরে। হঠাৎ গান থামিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তারিক ভাই, বললেন, 'আশ্চর্য, আপনাকে সারাটা রাত আটকে রাখলাম! কাজটা বোধহয় অন্যায় করেছি, কিন্তু সেজন্যে আমি দুঃখিত নই, শিমুল। দুঃখিত এই জন্যে নই যে আজ যে আনন্দ পেয়েছি, চিরকাল মনে থাকবে আমার।'

'আপনার ভক্ত আপনাকে সারা রাত ধরে পনেরো বিশটা গান শোনাল, কিন্তু একবারও তো বললেন না কেমন গায় সে!'

তারিক ভাই হাসলেন না। বললেন, 'আমার জীবনে আপনার আবির্ভাব, এর যেন বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে, শিমুল। দেখা যাচ্ছে একে একে আপনি আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন।'

'তাই? কি রকম?'

'বাণী আর শক্তিকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারছিলাম না, ছিটকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম, পেলাম আপনাকে। আপনি ওদের দায়িত্ব নিলেন, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিরাট একটা খুঁত ছিল, আমাকে আপনি দেখিয়ে দিলেন। আর আজ আপনার গান শুনে মনে হলো, আপনার সাহায্য পেলে বাচ্চাদের গান

শেখানোর একটা স্কুল অনায়াসে খোলা যায়। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে···।'

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনি এবার ঘুমান, আমি যাই। সকালে আমরা ঈদগাঁও যাব, মনে আছে?'

'আপনার ওপর অত্যাচার করেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই,' বললেন তারিক ভাই। 'দশটার দিকে বেরোব আমরা, কেমন? মানে, যদি আপনার ঘুম ভাঙে আর কি।'

'ভাঙবে না,' দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। 'কারণ আমি এখন ঘুমাতেই পারব না।'

'সেকি। কেন?'

'খুশিতে!' বলে ছুটে পালিয়ে এলাম।

চার

ঈদগাঁও যাবার পথে তারিক ভাই খুব কম কথা বললেন। একবার শুধু জানতে চাইলেন, আমি কি সত্যি ঘুমাইনি? বললাম, না। না ঘুমিয়ে কি করেছি সেটা অবশ্য ওঁকে জানালাম না। কাউকে বলার মত নয় সেটা। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে একটা মেয়ে কোন কারণ ছাড়াই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, এ-কথা কি কাউকে বলা যায়?

প্রায় যখন পৌঁছে গেছি, তারিক ভাই আমার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলেন, তারপর বললেন, 'আরেকদিন আপনি আমার সাথে বেড়াতে যাবেন। আপনার সঙ্গ ভীষণ অনুপ্রাণিত করে আমাকে। কথা দিন।'

'ঠি-ঠিক আছে।'

উঠানে ঢুকে দেখি রাক্ষসীটা বারান্দায় বসে আছে, হুইলচেয়ারের ওপর। তখনও আমি জানি না যে তারিক ভাই সকালে ফোন করেছিলেন মেহের আপাকে, ফলে ইতিমধ্যেই তাঁর জানা হয়ে গেছে যে বিলাসভবনে কচি আসেনি। মেহের আপার চেহারা আগুনের মত লাল হয়ে আছে, দেখে বুকটা আমার শুকিয়ে গেল। ডাক্তার জহির বা মোরশেদ খান, আশপাশে কাউকে দেখলাম না। অবশ্য একটু পরই দু'জন একসাথে উদয় হলেন, দুপুরে খেতে বসার আগে।

ভাইকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে জোর করে হাসলেন মেহের আপা। বেশ বোঝা গেল, হাসতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'কি রে ভাই, কেমন আছিস তুই? যাক, ভালয় ভালয় দেশে ফিরে এসেছিস, এতেই আমি খুশি।'

'হ্যাঁ, ফোনে তো তোমাকে বললামই—পুরো দলটা ফ্লুতে কাবু, একা শুধু আমি ছাড়া···।'

তারিক ভাইকে কথা শেষ করতে দিলেন না, মেহের আপা জানতে চাইলেন, 'কাল রাতটা তাহলে বিলাসভবনে ছিলি তুই?' কথা বলছেন ভাইয়ের সাথে, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির খোঁচা মারছেন আমার সর্বাঙ্গে। 'তা তোমার কি খবর গো? তুমিও কাল রাতে বিলাসভবনেই ছিলে তাহলে?'

'জ্বী,' ছোট্ট করে জবাব দিলাম আমি।

'বাচ্চাদের তুমি ওদের শোবার ঘরে পাবে.' মেহের আপা বললেন। 'এইমাত্র গোসল

করে কাপড় পরছে; যাও, ওদেরকে নিয়ে খেতে বসো। কি শেখাচ্ছ তুমিই জানো, কাল থেকে সামিনাকে জ্বালিয়ে মারছে।'

'জ্বালিয়ে মারছে? কিন্তু আমি থাকলে তো ওরা কারও সাথে বেআদবি করে না!'

তারিক ভাই আমার দিকে তাকালেন। 'এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, বুঝলেন শিমুল, কাজ হয় আপনার নরম ব্যবহারে। সামিনাকে তো চিনি, বাচ্চাদের সাথে অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করে সে। ওদের কোন কথায় সে গুরুত্বই দিতে চায় না, নিজে যেটা ভাল মনে করবে সেটা করাতে চাইবে।'

'এ তোর ভারি অন্যায়, তারিক,' প্রতিবাদ করলেন মেহের আপা। 'সামিনার মত আরেকটা কাজের মেয়ে এনে দে তো দেখি। গোটা সংসারটাকে মাথায় তুলে রেখেছে মেয়েটা, আর তুই বলিস কিনা···।'

'মাথায় তুলে রেখেছে আসলে তোমাকে,' বললেন তারিক ভাই। 'আসলে নিজের বাচ্চাকাচ্চা নেই তো, ওদের সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে বোঝে না। তুমিও জানো, শক্তি আর বাণী তাকে সহ্যই করতে পারে না।'

লক্ষ করলাম, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন মেহের আপা। 'যার দেখার কথা সে-ই যদি ছুটি নিয়ে ফুর্তি করতে চলে যায়, কে ওদের দেখবে, বল? আমি তো চেয়ারে বাঁধা, তাছাড়া আমার কথা ওরা শুনলে তো! জহির বলছিল, বাড়িতে এত অশান্তি বলেই আমার রোগটা বাড়ছে। সারাটা রাত একটু ঘুমাতে পারি না···।' হাঁপাতে শুরু করলেন মেহের আপা।

আমাকে আর কিছু বললেন না মেহের আপা। আরও অনেক কথাই বলার আছে তাঁর, তবে ভাইয়ের সামনে নয়। হাত ঝাপটা দিয়ে আমাকে বিদায় হতে বললেন তিনি। চলে আসছি, শুনতে পেলাম তারিক ভাইকে বলছেন, 'এবার আমাকে বল তো দেখি, নেপালে কি ঘটল? লক্ষ্মী মেয়েটাকে কেমন দেখলি, আমাদের রীনাকে?'

নিজেকে আমার পরিত্যক্ত ও অভাগিনী মনে হলো। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। তবে বাণী আর শক্তি আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ওদের হাসি-আনন্দ আমার ভেতরও ছড়িয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম।

কিন্তু তারিক ভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে শুরু হলো জেরা। আমার ভাই আসেনি কেন? যদি আসতেই পারবে না, আগে কেন জানায়নি সে? এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি যে আমি একেবারে শেষ মুহূর্তে জানতে পারলাম সে আসবে না? কোন্ স্পর্ধায় তারিক ভাইয়ের সাথে বেড়াতে গেলাম আমি? এ-পরিবারে আমি একজন নগণ্য কর্মচারী, কথাটা কি আমার ভুলে যাওয়া উচিত হয়েছে? এ-কথা কি সত্যি নয় যে আমি অন্যায় করেছি?

কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'শোনো, শিমুল, তোমার বাড়াবাড়ি আমি অনেক সহ্য করেছি, আর নয়!' চোখ পাকালেন মেহের আপা, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। 'আজ তোমাকে শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি আমি, আমার ভাইয়ের সাথে মাখামাখি কোরো না!'

'কি বলতে চান আপনি?' এবার আমিও সাপের মত ফণা তুললাম। 'তারিক ভাইকে বলব, আপনি বলছেন, ওঁর সাথে মাখামাখি করছি আমি?'

'তুমি আমাকে তারিকের ভয় দেখাও? শয়তান মেয়ে, দুশ্চরিত্রা···

'মুখ সামলে কথা বলুন!' চিৎকার করে উঠলাম। 'আপনি একটা নেহাতই বাজে মেয়েলোক। আজই শেষ, আপনাদের সাথে আমি আর থাকছি না।' দুশ্চরিত্রা বলায় অপমানটা সাংঘাতিক আঘাত করেছে আমাকে, কেঁদে ফেললাম আমি। কাঁদতে কাঁদতেই ছুটে বেরিয়ে এলাম।

শুনতে পেলাম মেহের আপা চিৎকার করছেন, 'জহির! জহির! আমার হার্ট···!'

বারান্দার বাঁক ঘুরতেই ধাক্কা খেলাম জহির ডাক্তারের সাথে। তাঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'কি হলো? হলো কি? কাঁদছ কেন, খুকী?'

চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে, নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলাম আমি। 'ছাড়ুন! যেতে দিন আমাকে!'

'জানি, তোমার এক নাম্বার দুশমন হয়ে উঠেছেন উনি,' জহির ডাক্তার আমাকে ছাড়ছেন না, আমার কানে ফিসফিস করছেন। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও, ওঁকে কিভাবে শান্ত করতে হয় আমার জানা আছে। কাঁদলে কিন্তু তোমাকে আরও সুন্দর লাগে, বুঝলে! তবে অনেক হয়েছে, লক্ষ্মী মেয়ে, এবার শান্ত হও···তা না হলে আমি কিন্তু তোমার মুখে হাতচাপা দেব···,' বলতে বলতে ঝট করে নিজের বুকে টেনে নিলেন আমাকে, চুমো খাবার জন্যে এগিয়ে আনলেন মুখটা।

আজও মনে আছে, ইতর ডাক্তারকে সেই মুহূর্তে আমার খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শক্তিশালী পুরুষমানুষ, আমি তার সাথে পারব কেন। শয়তানটা আমাকে জোর করে চুমো খেতে চাইছেন আর নিজেকে আমি ছাড়াবার চেষ্টা করছি, এই সময় কোত্থেকে যেন হঠাৎ উদয় হলেন মোরশেদ খান। আমাদেরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়। ইতিমধ্যে গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করেছেন জহির ডাক্তার, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন। বোবা বনে গেছি আমি, পিছিয়ে আসছি, কিন্তু উনিও সামনে বাড়ছেন।

বারান্দায় উঠে এলেন মোরশেদ খান, সহাস্যে বললেন, 'আদিম প্রবৃত্তির কাছে সবাই আমরা কাবু, বোঝা গেল প্রেম সাগরে খাচ্ছ হাবুডুবু!'

'না, উনি আমাকে জোর করে···,' কেঁদে উঠলাম আমি, ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম।

'লজ্জা পাচ্ছে!' খিকখিক করে হাসলেন জহির ডাক্তার, মোরশেদ খানের দিক থেকে আমার দিকে তাকালেন, আমার একটা হাত এখনও শক্ত করে ধরে আছেন। 'কথা দিচ্ছ, আমাকে তুমি বিয়ে করবে? যেদিন বলবে, সেদিনই মিসেস জহির করে নেব তোমাকে আমি। রাজরানীর মত থাকবে, সোনামণি।'

চিৎকার করে বললাম, 'আপনি একটা ইতর! আপনাকে আমি ঘৃণা করি!' ঝাপটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম হাতটা, ছুটে চলে এলাম নিজের ঘরে।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে কাঁদছি। এ আমি কাদের পাল্লায় এসে পড়েছি! এরা তো আমাকে মেরে ফেলবে! কান্না থামিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে বসলাম। এখানে আর আমার থাকা চলবে না। বাণী ও শক্তিকে অত্যন্ত ভালবাসি, ওদেরকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে আমার, কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব আমি। সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, মন না আবার বদলে যায়। তাড়াতাড়ি আমার সব

জিনিস-পত্র বিছানার ওপর জড়ো করলাম, তারপর একে একে ভরতে শুরু করলাম সুটকেসে।

কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছি, এই সময় দরজায় নক করলেন জহির ডাক্তার। 'মেহের আপা তোমাকে ডাকছেন, শিমুল। উনি অন্যায় করেছেন, সেজন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবেন। লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। দরজা খোল।'

সাড়া দিলাম না, কথা বলতে ঘৃণা হলো আমার।

আরও কিছুক্ষণ দরজা খোলাবার চেষ্টা করলেন তিনি, তারপর ফিরে গেলেন। এরপর হুইলচেয়ার চালিয়ে মেহের আপা নিজেই এলেন আমার দরজায়। বললেন, 'দরজা খোল, শিমুল। আমি অসুস্থ মানুষ, রাগের মাথায় কি বলেছি না বলেছি সে-কথা মনে রাখতে নেই। আগে যদি জানতাম যে তোমার সাথে জহির ডাক্তারের একটা সম্পর্ক চলছে তাহলে তো এসব প্রসঙ্গ তুলতামই না। দরজা খোল, শিমুল। আমি তোমার কাছে হাতজোড় করে মাফ চাইব। তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন যে জহির ডাক্তারকে তোমার ভাল লাগে?'

'এ-সব কি বলছেন আপনি! উনি আমাকে জোর করে···জোর করে···উনি আমাকে অপমান করেছেন! প্লীজ, মেহের আপা, আমাকে একটু একা থাকতে দিন। শুধু আজকের দিনটা, কালই আমি চলে যাচ্ছি।'

তারপরও প্রায় আধ ঘণ্টা দরজার সামনে থেকে নড়লেন না মেহের আপা। ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথাই বললেন। আমি নাকি লজ্জায় স্বীকার করছি না, তবে তিনি বুঝে ফেলেছেন জহির ডাক্তারকে আমি সাংঘাতিক ভালবাসি। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

আরও পনেরো মিনিট পর তারিক ভাইয়ের গলা পেলাম। 'শিমুল, শিমুল, একটু বাইরে আসবেন? আপনার সাথে একটু কথা বলব।'

বিছানা থেকে উঠে দরজা খুললাম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তারিক ভাই, গম্ভীর, মুখে হাসি নেই।

'আপনার সাথে এখন কথা বলা যাবে, শিমুল?' ভারি গলায় জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, ভেতরে আসুন,' শান্ত গলায় বললাম আমি, সরে দাঁড়ালাম একপাশে।

ঘরে ঢুকে খোলা সুটকেস দুটোর দিকে তাকালেন একবার। 'আপনি তাহলে সত্যি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমাকে ভাল করে দেখলেন তারিক ভাই। চুল এলোমেলো হয়ে আছে, চোখ দুটো এখনও ভেজা ভেজা। বললেন, 'এটা একটা বাড়ি নয়, নরক। কবে যে আমি শান্তি পাব!'

চুপ করে আছি, কি বলতে চান বুঝতে পারছি না।

'এখানে নয়, আপনার সাথে নিরিবিলি কোথাও কথা হওয়া দরকার আমার,' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন তারিক ভাই। 'আসুন আমার সাথে।'

কেউ দেখল কিনা জানি না, আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তারিক ভাই। সরাসরি পুকুর ঘাটে চলে এলাম আমরা। ঘাটে কেউ নেই, কাজেই ওখানেই বসলাম।

'সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা শুনে রীতিমত একটা ধাক্কা খেয়েছি। মেহের আপা বলল, আপনি নাকি তাকে বলেছেন যে এখানে আর থাকবেন না।'

'আর কিছু বলেননি? এরকম একটা কথা হঠাৎ করে কেন তাঁকে আমি বললাম

আপনি জিজ্ঞেস করেননি?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন তারিক ভাই, তারপর বললেন, 'দুলাভাইয়ের সাথে আগে কথা হয়েছে। উনি আমাকে বললেন…বললেন যে জহির ডাক্তারের সাথে আপনাকে নাকি আপত্তিকর অবস্থায় দেখা গেছে।'

'তারিক ভাই, এ-সব ওদের ষড়যন্ত্র! মোরশেদ সাহেব যা দেখেছেন তা সত্যি নয়! ডাক্তার আমাকে জোর করে…জোর করে…অপমান করার চেষ্টা করছিলেন, এই সময় উঠানে ঢোকেন উনি… ।'

'না, মানে, কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু এই জন্যে জানতে চাইছি যে… ।'

'প্লীজ, থামুন আপনি! চুপ করুন!' আবার আমি কেঁদে ফেললাম।

'আসলে আপনি সরল ও অনভিজ্ঞ, আপনাকে আমার সাবধান করে দেয়া উচিত বলে মনে করি। আপনার মত মেয়েদের জন্যে চারদিকে ফাঁদ পাতা আছে, সতর্ক না হলে বিপদে পড়তে হবে। আপনি যদি কাউকে বিয়ে করতে চান সেটা অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু জহির ডাক্তার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, বিয়ে করার কথা বলে মেয়েদেরকে শুধু ভোগায় সে, অন্তত তার রেকর্ড তা-ই বলে। আসলে… ।'

'আশ্চর্য, আপনিও আমাকে ভুল বুঝবেন, তারিক ভাই? আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, আমি কি বলছি? এ-সব মিথ্যে! একবিন্দু সত্যি নয়! আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? গোটা ব্যাপারটাই বানাচ্ছেন ওঁরা।'

'বানাচ্ছে? কে, কেন বানাচ্ছে?'

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালাম। 'বাদ দিন, তারিক ভাই। কেউ যদি আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে খুশি হয় তো হোক। কি বলছিলাম ভুলে যান। এবার আমাকে যেতে দিন।'

'যেতে দেব মানে…কোথায়?'

'আমি আমার ভাইয়ের কাছে ফিরে যাব, ঢাকায়।'

'কিন্তু আপনি চলে গেলে বাণী আর শক্তির কি হবে?' কি যেন ভাবলেন তারিক ভাই। 'গোটা ব্যাপারটা আরও ভাল করে বুঝতে হবে আমাকে,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আমাকে দিন কয়েক সময় দিন। কার কি বক্তব্য, সব আমি শুনব। তাছাড়া, আপনি এভাবে বিনা নোটিশে চলে যেতে পারেন না। অস্বীকার করতে পারবেন কি, বাণী আর শক্তির ব্যাপারে আপনার একটা দায়িত্ব আছে? আমার দিকটাও কি আপনি একবার ভেবে দেখবেন না? আপনি চলে গেলে এক মিনিটের জন্যে শান্তি পাব আমি? এ-বাড়িতে ওদেরকে দেখার মত কেউ আছে, আপনি ছাড়া?' হঠাৎ আঁতকে উঠলেন তারিক ভাই। 'কি হলো, শিমুল? আপনি অমন কাঁপছেন কেন?'

'ঠিক আছে, আমি যাব না,' ধরা গলায় বললাম ওঁকে। 'কিন্তু আজ আপনাকে না বলে পারছি না, এ এক অদ্ভুত পরিবেশ, তারিক ভাই। মেহের আপা কি কারণে কে জানে আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। উনি আজ আমাকে যা খুশি তাই বলে গালমন্দ করেছেন… ।'

'মেহের আপার যে মাথার ঠিক নেই, এত দিনে সে তো আপনিও বুঝতে পেরেছেন,' তারিক ভাই সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললেন আমাকে। 'আমি আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস

করি, শিমুল। আপনাকে আমার জানাতে ইচ্ছে করছে, আমি চাই না যে জহির ডাক্তার বা আর কাউকে আপনি বিয়ে করেন। বিয়ে তো একদিন আপনার হবেই, কিন্তু সেজন্যে এত তাড়া কিসের! আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দেখুন না আপনার জীবনে আর কেউ আসে কিনা। থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক। আপনি আমাদের সাথে থাকছেন তো? সত্যি চলে যাবেন না?'

মাথাটা কাত করে জানালাম, যাব না।

তারিক ভাই রুমালটা বের করে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। 'চোখ মুছুন এবার। মেহের আপা খুব নার্ভাস দেখলাম, ওকে গিয়ে বলুন যে আপনি যাচ্ছেন না। আপনি চলে যান, ও কিন্তু তা চায় না। আর জহিরের সাথে আমি নিজে কথা বলছি। ভবিষ্যতে যদি আপনাকে কখনও বিরক্ত করে, এ-বাড়িতে তাকে ঢুকতে দেয়া হবে না।'

'না, কি দরকার, তাঁকে কিছু না বলাই ভাল,' বললাম আমি। 'তাতে শুধু গোলমাল আরও বাড়বে। এখন থেকে আমি সাবধান থাকব, ধারেকাছে ঘেঁষতে দেব না, তাহলেই হবে। আরেকটা কথা, তারিক ভাই। এই মুহূর্তে মেহের আপার সামনে আমি যেতে পারব না। আমার হয়ে আপনিই তাকে জানিয়ে দিন, আমি থাকছি। বলবেন, বাণী আর শক্তির কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত পাল্টেছি আমি।'

'ঠিক আছে,' বলে উঠে দাঁড়ালেন তারিক ভাই। ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছি আমরা। দেখে মনে হলো, ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তারিক ভাই।

দেখতে দেখতে নভেম্বর এসে গেল। জুন মাসে বিলাসভবনে এসেছি আমি, তার মানে ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। ভাবতে আশ্চর্যই লাগে, এত ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করে আজও আমি এখানে টিকে আছি তাহলে!

তারপর তারিক ভাইয়ের ফোন এল। আমরা জানতে পারলাম, ওঁর সাথেই আগামী হপ্তায় রীনা চৌধুরী তার মেয়েকে নিয়ে বিলাসভবনে বেড়াতে আসছে। দেশের বাড়িতে ওদেরকে আমি দেখেছি, দেখেছি দূর থেকে। কেউ তার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। মেহের আপার কঠিন নির্দেশ ছিল, ভুলেও আমার রীনা চৌধুরীর সামনে যাওয়া চলবে না। তারিক ভাই ছিলেন না, থাকলে হয়তো পরিচয় করিয়ে দিতেন। রীনা চৌধুরী আসলেও অপরূপ সুন্দরী। শুধু যে সুন্দরী তা নয়, তার চলাফেরা ও আচরণে দারুণ আভিজাত্যের ভাব। দেখার পর তার প্রতি আমার ঈর্ষা আরও বরং বেড়েছে।

পরদিন সকালে বাগানে হাঁটছি আমি, একটা করে ফুল ছিঁড়ে বাস্কেটে রাখছি আর কান্না চাপতে চেষ্টা করছি। রীনার ঘর ফুল দিয়ে সাজাতে হবে আমাকে, এরমধ্যে কান্নার কি আছে জানি না। তবু বারবার চোখ দুটো ভিজে আসতে লাগল। নিজেকে বোঝালাম, আমার ভেতর কোন প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত নয়। দুনিয়ার বুকে আমি রীনা চৌধুরী হয়ে জন্মাইনি, সেজন্যে নিজেকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। তারিক ভাইয়ের খাস চাকর জব্বার আর লতাকে নিয়ে অতিথিদের কামরাটা সাজালাম। সাজালাম খুব সুন্দর করেই, চেষ্টা করলাম যাতে কোথাও কোন খুঁত না থাকে।

ঠিক হয়েছে, অতিথিদের কামরায় একাই শোবে রীনা চৌধুরী। নিজের বাড়িতেও মেয়েকে আলাদা কামরায় শোয়ায় সে। মেহের আপা যেচে পড়ে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাকে, বলেছেন, 'তারিককে বিয়ে করার কথা ভাবছে তো, তাই মেয়েটাকে

এখন থেকেই আলাদা শোয়ার অভ্যাস করাচ্ছে।'

পাপিয়া শোবে বাণীর সাথে।

ঘর সাজানো শেষ হয়েছে, সময়টা প্রায় দুপুর, রীনা আর তার মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন তারিক ভাই। শুনে আমি নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছি, মেহের আপা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বাঁকা হেসে বললেন, 'কি বলেছি মনে আছে তো? রীনা যে-ক'দিন থাকবে এখানে, ওদের পড়ার ঘরেই খাবে তোমরা—তুমি আর বাচ্চারা। এখন যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকো।'

ইচ্ছে করল চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু কোন অধিকারে? নিজেকে ধিক্কার দিলাম, কথায় কথায় শুধু কান্নাই পায় তোর?

ওদের আওয়াজ পেয়ে নিজের ঘর থেকে বেরুলাম আমি। পড়ার ঘরে ঢুকে দেখি, পাপিয়াকে গল্প আর ছবির বই দেখাচ্ছে বাণী। তিনটে মাথা এক হয়ে আছে দেখে হাসি পেল আমার। পাপিয়াকে আগেও দেখেছি, আগের চেয়েও যেন মোটা হয়েছে সে। অত্যন্ত দামি স্কার্ট ও ফ্রক পরে আছে সে, পায়ে সোনালি জুতো, একই রঙের মোজা। অনবরত চুইংগাম চিবাচ্ছে মেয়েটা।

হঠাৎ শুনি কি, দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ। কি ঘটতে যাচ্ছে বোঝার সময় পেলাম না, পড়ার ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন ওরা সবাই। প্রথমে ঢুকলেন তারিক ভাই, ওঁর পিছনে রীনা চৌধুরী, ওদের পিছু পিছু হুইলচেয়ার নিয়ে মেহের আপা।

তারিক ভাইয়ের দিকে তাকালাম আমি। উনি হাসছেন, কথা বলছেন গলা চড়িয়ে। 'এই যে শিমুল, কেমন আছেন আপনি?'

আড়ষ্ট হেসে বললাম, 'ভাল আছি, তারিক ভাই। আপনি কেমন আছেন?'

'শুনলাম দেশের বাড়িতে রীনা যখন বেড়াতে গেল, তার সাথে কেউ আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়নি। ভারি অন্যায়!' সকৌতুকে হাসছেন তারিক ভাই। 'রীনা, গাড়িতে ওঁর কথাই বলছিলাম তোমাকে। তাসমিনা রহমান, অর্থাৎ শিমুল—নামটার সাথে নরম তুলোর একটা সম্পর্ক থাকলেও, বিলাসভবনের ডিসিপ্লিন রক্ষায় ভারি কড়া ভূমিকা পালন করেন। বাণী আর শক্তিকে ওঁর হাতে তুলে দিয়ে পরম শান্তিতে আছি আমি। শিমুল, ও রীনা চৌধুরী—আমাদের পারিবারিক বন্ধু।'

রীনা আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম, দু'জনেই আমরা একটু হাসলাম। কিন্তু আমি বা রীনা, কেউ কারও সাথে কথা বললাম না।

পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনার জন্যে মেহের আপা বললেন, 'তোর বাজে প্যাঁচাল শেষ হয়েছে? এবার তাহলে চল, ডাইনিংরুমে খাবার দেয়া হয়েছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

মেহের আপা থামতেই শক্তি বলল, 'আব্বু, আমরা তোমার সাথে খাব!'

'না!' চোখ রাঙালেন মেহের আপা। 'রীনার সাথে অনেক জরুরী আলাপ আছে আমাদের, ছোটদের সে-সব শোনা উচিত নয়। আগেই তো বলেছি, তোমাদের খাবার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

লক্ষ করলাম, ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছেন তারিক ভাই।

মেহের আপা আদেশের সুরে বললেন, 'তারিক, আমার কথার ওপর কথা বলবি না। চলে আয়। এসো, রীনা।'

'পরে, কেমন?' বাচ্চাদের দিকে ফিরে চোখ মটকালেন তারিক ভাই, তারপর বোনের

পিছু পিছু রীনা চৌধুরীকে নিয়ে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বললেন বটে পরে, কিন্তু দিনের বাকি সময় আমরা ওঁর আর দেখা পেলাম না। বিকাল বেলা ড্রাইভার আমাদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে এল। বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় জানতে পারলাম, মেহের আপা নিজের ঘরে আছেন, আর রীনা চৌধুরী গল্প করছে তারিক ভাইয়ের সাথে, ওঁর কামরায়।

এক ঘণ্টা বেড়িয়ে ফিরে এলাম আমরা। শুনতে পেলাম তারিক ভাইয়ের কামরায় টেপ রেকর্ডার বাজছে। সেদিন জীবনানন্দ দাশের যে কবিতাটা উনি আবৃত্তি করেছিলেন, সেটাই বাজিয়ে শোনাচ্ছেন রীনাকে। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, একটা সোফায় পাশাপাশি বসে আছে ওরা। মুহূর্তের জন্যেও ওঁর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না রীনা, আমার তারিক ভাইও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কল্পনাটাকে থামতে না দিয়ে নিজের ওপর পীড়ন শুরু করলাম আমি। এ আত্মপীড়ন নয় তো কি! কারণ আমি দেখতে পেলাম, তারিক ভাই রীনার একটা হাত ধরে আছেন। দেখতে পেলাম, রীনা তার ফর্সা বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছে তারিক ভাইকে।

ইচ্ছে হলো ছুটে যাই, তারিক ভাইয়ের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি, 'বন্ধ করুন! গান থামান!' আমি যে কতটা উতলা হয়ে পড়ছি, হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে পাগল হতে আর বেশি বাকি নেই, বুঝতে পারলাম হঠাৎ তারিক ভাইয়ের কামরার কাছে নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কখন যে ঘর থেকে বেরিয়ে এখানে চলে এসেছি, নিজেও বলতে পারব না।

রেকর্ড থামল। শুনতে পেলাম রীনা বলছে, 'দারুণ! ওয়াণ্ডারফুল! ওহ্ ডিয়ার, তোমার গলা আমাকে পাগল করে দেবে!'

আরও শুনতে পেলাম, গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন তারিক ভাই।

ছুটে পালিয়ে এলাম আমি। ধিক্কার দিলাম নিজেকে—ছি, আড়ি পেতে ওদের কথা শুনতে তোর লজ্জা করল না!

জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি, এই দুই মাস তারিক ভাইকে দেখলামই না। টেলিফোনে বাণী আর শক্তির সাথে কথা বলেন, কথা বলেন মেহের আপার সাথে, কিন্তু আমার সাথে বলেন না। ওদের কাছ থেকে জানতে পারি, ব্যবসার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন তিনি, রোজার মাসের আগে চট্টগ্রামে আসতে পারবেন না।

পনেরো রোজার দিন বাড়ি ফিরলেন তারিক ভাই। দু'কাঁধে দুই বাচ্চাকে নিয়ে সরাসরি পড়ার ঘরে ঢুকলেন তিনি। ওদের খাতা দেখছিলাম, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'আমাদের ডিসিপ্লিন কমিটি চেয়ারপারসন কেমন আছেন?' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন তারিক ভাই, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত, ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করছে আমার, ঘেমে যাচ্ছি। তারিক ভাইয়ের অবাক হওয়ার কারণটা আর কেউ না জানলেও, আমি তো জানি।

কেন বা কিভাবে বলতে পারব না, গত দু'মাসে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে আমার চেহারায়। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে দেখে নিজেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। রোজা শুরু হবার পর থেকে আমার রূপ আরও যেন খুলেছে; বোধহয় আগের চেয়ে বেশ একটু রোগা হয়েছি, সেটাই আসল কারণ।

'কেমন আছেন, তারিক ভাই?'

'দাঁড়ান, আমার কথা পরে। আগে বলুন, আপনি এত সুন্দর হলেন কিভাবে?'

হেসে ফেললাম। ওঁকে লজ্জা দেয়ার সুযোগটা ছাড়লাম না। বললাম, 'হয়েছি? আগে বুঝি কুৎসিত ছিলাম আমি?'

'না-না! তা বলছি না! সুন্দর আপনি বরাবরই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে···চোখ ফেরানো কঠিন!'

'বসুন, তারিক ভাই, ঘাড় থেকে ওদেরকে এবার নামান!'

'আপনাকে ওরা আমার ঘরে নিয়ে যেতে এসেছে,' বললেন তারিক ভাই। 'আসুন, জলদি!'

সবাই আমরা তারিক ভাইয়ের কামরায় চলে এলাম।

ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর বড় বড় তিনটে সুটকেস রেখে গেছে চাকর-বাকররা, এগুলো ঢাকা থেকে এনেছেন তারিক ভাই। বাচ্চাদের নিয়ে সুটকেসগুলো খুলছেন তিনি। আমাকে বললেন, 'আপনার প্যাকেটটা আপনি নিয়ে যান, প্লীজ।'

জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার প্যাকেট মানে?

প্রথম তিনি বাচ্চাদের প্যাকেটগুলো বের করে খুললেন। এক মুহূর্তে হাসি আর আনন্দে ভরে উঠল ঘরটা। শক্তি ও বাণীর জন্যে তিন সেট করে ড্রেস কিনেছেন তারিক ভাই, সবই লেটেস্ট ফ্যাশনের। দু'জোড়া করে জুতো, দু'জোড়া করে স্যাণ্ডেল। আরও আছে অসংখ্য খেলনা। ছেলেমেয়েরা নিজেদের জিনিস-পত্র নিয়ে ব্যস্ত, নীল কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন তারিক ভাই আমার হাতে। উনি দিচ্ছেন, আমাকে নিতে হলো। না জানি কি আছে ভেতরে, ওজনটা অনুভব করে একটা ঢোক গিললাম আমি। কম করেও সের পাঁচেক তো হবেই। 'কি আছে এর ভেতরে, এত ভারি কেন?'

'সোজা নিজের ঘরে চলে যান, খুলে দেখুন কি এনেছি আপনার জন্যে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসব, বাধা পেলাম। হুইলচেয়ার নিয়ে দোরগোড়ায় থাকলেন মেহের আপা। 'তারিক, এ তোর কি ধরনের আচরণ বল তো? আগে তো কখনও এরকম করিসনি!'

'মেহের আপা! কেমন আছ, আপা? কেন, কি হয়েছে? আমি তো তোমার আর দুলাভাইয়ের সুটকেস প্রথমেই তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি!'

'সে-কথাই তো জানতে চাইছি! পাঠাবি যদি তো সবগুলো সুটকেসই তো পাঠাবি, শুধু আমাদের দু'জনেরটা পাঠাবি কেন? আগে তো কখনও···!'

'ও, এই কথা!' তারিক ভাই হাসলেন। 'আগে তো বাণী আর শক্তির দায়িত্ব ছিল তোমার ওপর। এখন শিমুলের ওপর। সেজন্যে ভাবলাম, ছেলেমেয়েরা যার দায়িত্বে মানুষ হচ্ছে তার সামনেই সুটকেসগুলো খুলি। যদি কিছু বাদ পড়ে যায়, শিমুলের চোখে ঠিকই ধরা পড়বে।'

'বাইরের একটা মেয়ে, সে হলো অভিভাবক! আর আমি আপন ফুফু, আমি কেউ না?'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেহের আপার গলা জড়িয়ে ধরলেন তারিক ভাই। 'কি বলছ! আমার এই পুরো সংসারটাই তো তোমার। কেউ তোমার ওপর কথা বলে দেখুক না···!'

'ওর হাতে ওটা কি?' একটু নরম হলেন মেহের আপা, তাকিয়ে আছেন আমার হাতের প্যাকেটের দিকে।

'ঈদের উপহার,' বললেন তারিক ভাই।

'তা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু কি উপহার?' মেহের আপার কণ্ঠস্বর ধারাল ছুরির মত।

'ওগুলো ভাল-মন্দ যাই হোক, আমাকে দায়ী করা চলবে না,' হাসিমুখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন তারিক ভাই। 'কারণ আমাকে যা কিনতে বলা হয়েছে আমি তাই কিনেছি।'

'ও, শিমুল তাহলে তোকে চিঠি লিখে এ-সব কিনে দিতে বলেছে?'

'ছি-ছি, এরকম একটা নোংরা কথা তুমি ভাবতে পারলে! শিমুল কেন চিঠি লিখবেন! ফোনে বাণী আর শক্তিই আমাকে জানিয়েছে, শিমুল আন্টিকে তারা কি দিতে চায়। ওরা যা যা বলেছে আমি তাই কিনেছি।'

'ওরা দুধের বাচ্চা, নিজে থেকে কেন বলতে যাবে!' মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন মেহের আপা। 'ওদেরকে যা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে ওরা তোকে তাই বলেছে। এসব আমি খুব ভালই ধরতে পারি!' বলে আর দাঁড়ালেন না, চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ইচ্ছে হলো হাতের প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে ছুটে চলে যাই। আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন তারিক ভাই, তাড়াতাড়ি বললেন, 'মেহের আপার এটা একটা রোগ, মানুষকে অযথা অপমান করা। আপনি মাইণ্ড করবেন না, প্লীজ। শুধু মনে রাখবেন, এটা আমার বাড়ি।'

প্যাকেটটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে ওটা আর খুলতে ইচ্ছে করল না।

পাঁচ

বাচ্চাদের ঈদ উপহার দেয়ার জন্যে আগেই মনে মনে তিন হাজার টাকার একটা বাজেট করেছিলাম আমি।

তারিক ভাইয়ের জন্যে কিনলাম একটা পার্কার কলম। লতা ও সামিনার জন্যে দুটো শাড়ি; করিম মিয়া, জব্বার ও শরাফত মিয়ার জন্যে তিনটে লুঙ্গি। মেহের আপাকে কি দেয়া যায় ভাবছিলাম, হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ইদানীং উনি পান খাওয়া ধরেছেন, অনেক খুঁজে তাঁর জন্যে কিনলাম তামা ও পিতলের তৈরি একটা পানের বাটা, হামান দিস্তা সহ। মোরশেদ খানের জন্যে কিনলাম এক সেট তুলি ও রঙ, উনি ছবি আঁকতে পছন্দ করেন। আর আমার প্রিয় দুই ছাত্র-ছাত্রীকে দিলাম একরাশ জিনিস—ছবি, চীনামাটির মূর্তি, কাপড়ের তৈরি জাপানী পুতুল, ভিউকার্ড, বই, খেলনা, স্টিকার, স্ট্যাম্প, চুলের কাঁটা ও ক্যাপ, সাথে দু'বাক্স চকলেট।

পুরো এক হপ্তা বাড়িতে থাকলেন তারিক ভাই। যদিও ওঁর সাথে খুব কমই দেখা হলো আমার। একা হওয়ার কোন সুযোগই আমরা পেলাম না। বাড়িতে আনন্দ উল্লাসের একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। মোরশেদ খান দিয়েছেন এক সেট রুমাল। মেহের আপার উপহার দেখে বোঝা গেল উনি আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে চান—একজোড়া ক্রুশকাঠি, উলের একটা বল, একবাক্স সূঁচ, ও রঙবেরঙের সুতোর অনেকগুলো কাঠিম।

তিন দিন পর কৌতূহলেরই জয় হলো, ঘরের দরজা বন্ধ করে তারিক ভাইয়ের দেয়া প্যাকেটটা খুললাম আমি। নীল প্যাকেটটা লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। প্যাকেট খুলে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল আমার। সাথে সাথে বুঝলাম, এ-সব কিছুই এ-বাড়ির কাউকে দেখানো উচিত হবে না। দেখার দরকার নেই, মেহের আপা যদি শোনেন শুধু, বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠবে।

এ-ব্যাপারে বেশি চিন্তা করার সুযোগ পেলাম না, কারণ নতুন একটা আতঙ্ক এসে ভর করল আমার ওপর। শুনতে পেলাম, এ-বাড়ির লোক না হলেও প্রতি ঈদে জহির ডাক্তারও সবাইকে নাকি ছোটখাট একটা করে উপহার দেন। আমাকে দেবেন, এই ভয়ে শঙ্কিত বোধ করলাম আমি।

আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

বাড়ির আর সব কর্মচারীর মত আমাকেও আড়াই মাসের বেতনের সমান বোনাস দেয়া হলো। চেকটা হাতে পেয়ে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। কারণটা নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। ভাবলাম, না চাইতেও প্রচুর টাকা, অপ্রত্যাশিত উপহার, এ-সব কিসের লক্ষণ? আমি ওঁর ছেলেমেয়েদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি মানুষ করার জন্যে, সেজন্যে ঋণী বোধ করছেন উনি? সেই ঋণ এভাবে পরিশোধের চেষ্টা করছেন?

ঢাকায় ফিরে গেলেন তারিক ভাই। মাত্র দু'দিনের জন্যে, তারপর আবার বাড়িতে এলেন। এবার সত্যি ঘাবড়ে গেলাম আমি। আবারও আমার জন্যে একটা উপহারের প্যাকেট এনেছেন উনি। ডাইনিংরুমে, খাওয়া শেষ হতে, আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা আমার তরফ থেকে।' প্যাকেটটা ছোট, কে জানে কি আছে ভেতরে।

মেহের আপা সামনেই ছিলেন, তিনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'প্রথমটা তাহলে কার তরফ থেকে ছিল রে তারিক?'

'কেন, শিমুল তোমাকে বলেনি? ওগুলো তো বাণী আর শক্তি দিয়েছে ওঁকে।'

'ওরা কি রোজগার করে নাকি যে টিচারকে উপহার কিনে দেবে? এতটা বাড়াবাড়ি করা কি উচিত হচ্ছে?' রাগে লালচে হয়ে উঠল মেহের আপার চেহারা।

তারিক ভাই হাসলেন। 'আমার যত রোজগার সবই তো আসলে বাণী আর শক্তির জন্যে। আমার যা কিছু আছে, সবই তো ওদের। এখানে আর কারও তো কিছু নেই। যাকে যা খুশি তাই দিতে পারে ওরা।'

'তা, হ্যাঁ-রে তারিক, তোর তরফ থেকে আমাকে কিছু দিলি না যে?'

'দিলাম না মানে? এক সুটকেস ভর্তি কাপড়চোপড় তাহলে কে দিল তোমাকে, মেহের আপা?'

'ও, ওগুলো তাহলে তোর তরফ থেকে। তা তোর ছেলেমেয়েরা যে আমাকে কিছু দিল না?'

'ওরা যে নিজে থেকে দেবে না, সে আমি জানতাম,' তারিক ভাইয়ের মুখের হাসি আড়ষ্ট হয়ে উঠল। 'সেজন্যেই তো প্রতি বছরের চেয়ে এবার তোমাদেরকে আমি বেশি জিনিস কিনে দিয়েছি, তোমার মনে যাতে কোন দুঃখ না থাকে। আরও যদি কিছু দরকার থাকে তো বলো, কালই আমি কিনে দেব। আমি তোমার একমাত্র ভাই, ভাইটি গরীবও নয়।'

'তোর একমাত্র বোনটিও কিন্তু গরীব নয়,' মেহের আপা গম্ভীর সুরে বললেন। 'ভুলে যাসনি, তোর সংসারটা দেখাশোনার জন্যেই এখানে আছে সে, নিজের কোন স্বার্থে নয়।

তা বাইরের একটা মেয়েকে কি দিলি তোরা, আমাকে তো একবার দেখালিও না। তুই-ই বা কি দিলি, তোর ছেলেমেয়েরাই বা কি দিল। আমি তোর গুরুজন, এ-বাড়ির কর্ত্রী, আমাকে জানানোরও প্রয়োজনবোধ করলি না, দেখতেও দিলি না?'

চোখে প্রশ্ন, তারিক ভাই আমার দিকে তাকালেন।

অগত্যা মুখ খুলতে হলো আমাকে। 'এত কিছু, এত দামি সব জিনিস, সত্যি আমি আশা করিনি। কোন সন্দেহ নেই, তারিক ভাইয়ের বাড়াবাড়ি হয়েছে। যা দিয়েছেন, সব আমি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, মেহের আপা।' হাতের প্যাকেটটার দিকে তাকালাম, বললাম, 'আর এটার ভেতর কি আছে, এখনও আমি জানি না। খুলব?'

'না,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিলেন তারিক ভাই। 'পরে আপনি সবাইকে যদি দেখাতে চান, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রথম একা আপনি দেখবেন। ওটা আপনাকে দেয়া আমার ব্যক্তিগত উপহার।'

'ব্যক্তিগত উপহার? বাইরের একটা মেয়েকে?' রাগে কেঁপে উঠল মেহের আপার গলা। 'তোর কি মাথাখারাপ হলো, তারিক?'

'মেহের আপা, আগেও তোমাকে আমি নিষেধ করেছি, শিমুলকে তুমি বাইরের একজন ভাববে না,' প্রায় কঠিন সুরে বললেন তারিক ভাই। 'এ-বাড়ির লোকেরা আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে যা করে, তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি করছেন উনি। তারপরও ওঁকে তুমি বাইরের মেয়ে বলো কি করে?'

মোরশেদ খানের দিকে তাকালেন তিনি। 'দুলাভাই, আপাকে আপনাদের ঘরে নিয়ে যান। শিমুল, জিনিসগুলো আপাকে একবার দেখাবেন, প্লীজ?'

বেরিয়ে এলাম ডাইনিংরুম থেকে। সামিনাকে ইঙ্গিতে ডাকলাম, উপহারগুলো সব ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'মেহের আপাকে এগুলো দেখিয়ে আন। ওঁর দেখা হয়ে গেলে সব আবার আমাকে দিয়ে যাবে, কেমন?'

'জ্বে, আচ্ছা,' বলে চলে গেল সামিনা।

ঘরে আমি একা, তারিক ভাইয়ের ছোট্ট প্যাকেটটা এবার খুললাম। গালে হাত দিয়ে বিছানার ওপর বসে থাকলাম। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, নড়ার শক্তি পাচ্ছি না। আমার মন বলছে, এ বাড়িতে আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তারিক ভাই যা শুরু করেছেন, এর পরিণতি ভাল হতে পারে না। প্রথমে উনি একজোড়া জামদানি শাড়ি দিয়েছেন, দাম হবে বারো থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে। তাছাড়াও আরও দুটো কাতান দিয়েছেন। দু'সেট সালোয়ার-কামিজের সাথে একটা উলেন চাদরও আছে। জুতো, মেকআপ বক্স ইত্যাদি তো আছেই। আর আজ দিয়েছেন গহনা! পাথর বসানো অপূর্ব সুন্দর একটা নেকলেস।

বুঝতে পারলাম না আসলে কি চাইছেন তারিক ভাই। এতসব দামি জিনিস দেয়ার পিছনে ওঁর উদ্দেশ্যটা আসলে কি? উপহার দেয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই, কিন্তু পরিমিতি জ্ঞান হারালে চলবে কেন! এ-বাড়িতে সামান্য একজন টিচার হিসেবে আছি আমি, এ-সব জিনিস আমাকে দেয়া ওঁর মানায় না। মেহের আপা যদি অসন্তুষ্ট হন, তাঁকে আমি দোষ দিই কিভাবে?

আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠল। না জানি কি হয় এরপর। ভাবলাম, মেহের আপাকে দেখানোর দরকার নেই, এই নেকলেস আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসি তারিক ভাইকে, জানিয়ে দিই, ওঁর এ উপহার আমি নিতে পারব না।

করিডর ধরে হাঁটছি, শুনতে পেলাম কলিংবেল বাজছে। কে এল দেখার জন্যে ঘুরে

দাঁড়ালাম, ঢুকলাম হলঘরে। দরজা খুলে দেখি, জহির ডাক্তার। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম, তাঁকে আমি যমের মত ভয় পাই। দরজা বন্ধ করে আমার পিছু নিলেন তিনি।

'শোনো, খুকী,' হাসছেন জহির ডাক্তার, দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। 'তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

পিছিয়ে আসছি আমি, বললাম, 'আমার সাথে আপনার কোন কথা থাকতে পারে না। আপনি মেহের আপার কাছে যান, উনি তাঁর ঘরেই আছেন।'

কিন্তু দরজার দিকে নয়, জহির ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে হাতটা বের করলেন তিনি। ছোট্ট একটা প্যাকেট দেখালেন আমাকে। 'এটা তোমার জন্যে এনেছি। ঈদের উপহার,' বলেই প্রায় ছুটে এসে আমার একটা কব্জি ধরলেন তিনি, জোর করে হাতে ধরিয়ে দিলেন ছোট্ট প্যাকেটটা। ইতিমধ্যে পিছিয়ে এসে দেয়ালের কাছে চলে এসেছি আমি, আমাদের মাথার ওপর শারমিন সুলতানার পোর্টেইট। চট করে ছবিটার দিকে একবার তাকাল জহির ডাক্তার, ফিসফিস করে আমাকে বললেন, 'দামি একটা সেন্ট উপহার দিয়েছি তোমাকে—ও যেটা ব্যবহার করত।'

প্যাকেটটা তাঁর হাতে গুঁজে দিলাম আমি। 'আপনার কোন উপহার আমি নেব না। আপনি আমার হাত ছাড়ুন, তা না হলে চিৎকার করব!'

'বোকা মেয়ে!' আমার কানের কাছে ঠোঁট সরিয়ে এনে ফিসফিস করলেন জহির ডাক্তার। 'এ আমার ভালবাসারই নমুনা, বুঝতে পারছ না? শারমিনকে ভালবাসতাম, কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সে। তারপর তোমাকে দেখেই আমি ভালবেসে ফেললাম, কারণ শারমিনের সাথে অনেক মিল আছে তোমার—সেজন্যেই তো ওকে যে সেন্ট উপহার দিতাম, তোমার জন্যেও সেই একই জিনিস কিনে এনেছি। প্লীজ, সোনা, আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না!'

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলাম। ভাবলাম সেদিনের মত ভুল করব না, তাই চিৎকার করার জন্যে মুখ খুললাম, কিন্তু উনি আমার মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। 'আমার দিকে হাত বাড়াও, শিমুল,' সারাক্ষণ আমার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করছেন তিনি। 'আমাকে তুমি নাগালের মধ্যে পাবে। শারমিন আমাকে ভালবাসত, সেজন্যে ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরত তারিক—তার ভয়েই পালিয়ে গেল শারমিন। ওর দিকে হাত বাড়ালে কোন লাভ নেই, ও চিরকালই তোমার নাগালের বাইরে থেকে যাবে। আমি জানি, ও তোমাকে আমার ব্যাপারে হতাশ করার চেষ্টা করেছে। বোধহয় এ-কথাও বলেছে যে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। বলো, আমাকে তুমি ভালবাসবে না?' বর্বর লোকটা আমাকে এবার জোর করে চুমো খাবার চেষ্টা করলো।

মাথাটা পিছিয়ে আনলাম সবেগে, দেয়ালে ঠুকে গেল খুলি। ব্যথায় সর্ষে ফুল দেখলাম চোখে। ঘেমে গেছি, হাঁপাচ্ছি ঘন ঘন। আমার কানে সারাক্ষণ বিষ ঢালছেন শয়তান ডাক্তার। 'তোমাকে দেখার পর থেকে পাগল হয়ে আছি আমি, শিমুল। তুমি আমাকে পছন্দ করো না, সেজন্যেই তো আরও বেশি আকর্ষণবোধ করি। এ-ব্যাপারে শারমিনের ঠিক উল্টো তুমি। আমি একজন ডাক্তার, আমার প্রস্তাব বিবাহিতা-অবিবাহিতা কোন মেয়েই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। শারমিন তো আমার চুমো পাবার জন্যে সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকত, বিশ্বাস করো···।'

'ইউ বাস্টার্ড! ইউ লায়ার!' আমাদের ডান পাশ থেকে গর্জে উঠল ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বর। ইতিমধ্যে আমি কাঁদতে শুরু করেছি। এ-সব কি শুনছি আমি! এ আমি কোন

বিপদে পড়লাম! তাকিয়ে দেখি, হলরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারিক ভাই, চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে।

আমাকে ছেড়ে দিলেন জহির ডাক্তার। টাইয়ের নটটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন, হঠাৎ করে যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। বেসুরো গলায় হেসে উঠলেন, বললেন, 'আপনি ভুল বুঝেছেন, তারিক সাহেব। ঠিক কি বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি ভাল করে শোনেননি··· আমি আসলে শিমুলকে বলতে চাইছিলাম··· ।'

'আজ বুঝতে পারলাম, তুমিই আমার জীবনটা ধ্বংস করেছ!' মারমুখো হয়ে ছুটে এলেন তারিক ভাই, রাগে থরথর করে কাঁপছেন তিনি। জহির ডাক্তারকে কোন সুযোগ দিলেন না, কাছে এসেই প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বসলেন তাঁর মুখের ওপর। মুখে হাতচাপা দিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন শয়তান ডাক্তার। থুথু ফেললেন, থুথুর সাথে একটা দাঁত খসে পড়ল কার্পেটের ওপর। খেপে গেছেন তারিক ভাই, ওঁর হিংস্র চেহারা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। এরপর তিনি ডাক্তারের পেটে আরেকটা ঘুসি মারলেন। ছিটকে পড়ে গেলেন ডাক্তার, তাঁকে লাথি মারার জন্যে ছুটে গেলেন তারিক ভাই।

তাড়াতাড়ি উঠে বসার চেষ্টা করলেন ডাক্তার, চিৎকার করে বললেন, 'তারিক সাহেব, খবরদার! আমার গায়ে হাত তুলবেন না! এর ফল কিন্তু ভাল হবে না··· ।'

কিন্তু তারিক ভাই যেন আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেছেন, ডাক্তারের কথা বোধহয় শুনতেও পেলেন না। ছুটে এসে তাঁর পাঁজরে লাথি মারলেন আবার।

'বাঁচান! কে কোথায় আছেন, আমাকে বাঁচান! মেরে ফেলল! মেহের আপা! মোরশেদ ভাই! মেরে ফেলল!'

ছুটে গেলাম আমি। তারিক ভাইকে ধরে ফেললাম। ফোঁপাচ্ছি আর মিনতি করছি, 'আপনার দুটো পায়ে পড়ি, শান্ত হোন। তারিক ভাই, আপনি আমার মাথা খাবেন, থামুন এবার!'

রক্তচক্ষু মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তারিক ভাই। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন, ঘামে ভিজে গেছে মুখটা।

'উনি পাগল হয়ে গেছেন!' তারস্বরে চিৎকার করছেন ডাক্তার। 'আমাকে মেরে ফেলবে! বাঁচান! মেহের আপা··· ।'

এই সময় হুইলচেয়ার নিয়ে হলঘরে ঢুকলেন মেহের আপা। তাঁর পিছু পিছু এলেন মোরশেদ খান। কার্পেটের ওপর প্রিয় ডাক্তারকে পড়ে থাকতে দেখে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল মহিলার।

'মেহের আপা, আমাকে বাঁচান আপনি! তারিক সাহেব পাগল হয়ে গেছেন! আমি এখুনি এখান থেকে চলে যেতে চাই··· ।'

চোখে আতঙ্ক, ভাইয়ের দিকে তাকালেন মেহের আপা।

দেখলাম, মুখ তুলে স্ত্রীর ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন তারিক ভাই। ওঁর ভাব দেখে মনে হলো, উনি যেন অন্য জগতে চলে গেছেন, আমাদের মধ্যে নেই। ওঁর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, চোখে সন্দেহ ও প্রশ্ন—যেন নিহত স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন, এই তুমি আমাকে ভালবাসতে? তোমাকে ভালবেসেছিলাম, এই তার প্রতিদান?

'তারিক!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন মেহের আপা। 'এ-সব আমি কি দেখছি? তুই কি পাগল হয়ে গেলি?'

'ব্যাপারটা সত্যি খুব দৃষ্টিকটু,' বললেন মোরশেদ খান। 'তুমি তোমার নিজের বাড়িতে একজন ভদ্রলোককে এভাবে অপমান করতে পারো না। কি নিয়ে ঘটল ব্যাপারটা?'

ধীরে ধীরে মুখ নামালেন তারিক ভাই। অনেকক্ষণ ধরে একে একে সবাইকে দেখলেন তিনি। সবশেষে আমার দিকে তাকালেন। 'শিমুল, শরাফত মিয়াকে একটু ডাকবেন, প্লীজ? ওকে বলবেন, আজই যেন ছবিটা নামিয়ে রাখে সে। এ-বাড়ির কোথাও ওটা আমি দেখতে চাই না।' আবার তিনি একে একে সবার দিকে তাকালেন। 'তোমাদেরকে শেষ বার বলে দিচ্ছি, কেউ কখনও ভুলেও এ-বাড়িতে শারমিনের নাম উচ্চারণ করবে না। শিমুল, খানিক পর আমার ঘরে একবার আসবেন আপনি, প্লীজ?' বলে আর দাঁড়ালেন না, হলরুম থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন জহির ডাক্তার, হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন পেটটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার দিকে এগোলেন।

'এসো,' আদেশের সুরে বললেন মেহের আপা, চেয়ার ঘুরিয়ে এগোলেন দরজার দিকে। পিছু নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলাম আমি, ঢুকলাম তাঁর ঘরে।

'আপনাকে এক কাপ গরম চা এনে দেব, বিবিসাব?' দরজার কাছ থেকে উঁকি দিয়ে জানতে চাইল সামিনা।

'না,' বললেন মেহের আপা। 'তুই যা। লক্ষ্য রাখবি, কেউ যেন এদিকে না আসে।' দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে সরে গেল সামিনা। এরপর আমার দিকে তাকালেন মেহের আপা। 'দাঁড়িয়ে থেকো না, বসো,' বললেন আমাকে। 'ঠিক কি ঘটেছিল বলো এবার। সাবধান, কিছু লুকাবে না! প্রথমে বলো কি নিয়ে ওরা মারামারি শুরু করল।'

'তারিক ভাইয়ের ঘরে যাব বলে করিডরে বেরিয়ে এসেছি, এই সময় কলিংবেলের আওয়াজ শুনে হলরুমে এসে দরজা খুলি আমি। ভেতরে ঢুকেই আমার হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিলেন জহির ডাক্তার। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরারও চেষ্টা করেন। বলছিলেন, আমার জন্যে দামি একটা সেন্ট কিনে এনেছেন। এই সেন্টই তিনি নাকি শারমিন সুলতানাকে কিনে দিতেন। তারপর বললেন, শারমিন সুলতানাকে ভালবাসতেন তিনি। তারপর বললেন, শারমিন সুলতানা নাকি তাঁকে··· তাঁকে···চুমো···খেত···!'

'সর্বনাশ! এখন কি হবে!' উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকালেন মেহের আপা, যেন লুকোবার একটা জায়গা খুঁজছেন। 'তারিক সব বুঝে ফেলেছে তাহলে! ডাক্তারও আর কোনদিন এ-বাড়িতে আসবে না!'

'আপনি কি চান, এরপরও তিনি এ-বাড়িতে আসেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'তারিক ভাইয়ের স্ত্রী সম্পর্কে উনি যে নোংরা মন্তব্য করেছেন···।'

'কিসের নোংরা মন্তব্য?' খেঁকিয়ে উঠলেন মেহের আপা। 'এমনও তো হতে পারে, জহির মিথ্যে কিছু বলেনি? মাগীকে আমি দু'চোখে সহ্য করতে পারতাম না—একে একে সবাইকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সে! তাকে আমি ঘৃণা করতাম। এখনও ঘৃণা করি! খানকীটা মরে গেছে, তবু এখনও আমার প্রিয় ডাক্তারকে ছাড়েনি, আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে···।' ফোঁপাতে শুরু করলেন তিনি।

ইচ্ছে হলো, ছুটে পালাই। কিন্তু না বলে পারলাম না, 'মেহের আপা, ডাক্তার আপনার প্রিয় হয় কি করে? উনি তো নেহাতই একটা শয়তান!' বলে আর দাড়ালাম না, ছুটে বেরিয়ে এলাম।

করিডর ধরে ছুটছি, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারিক ভাই। 'কি হলো, অমন

ছুটছেন কেন? কি হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম। 'পথ ছাড়ুন, তারিক ভাই। আমাকে আমার ঘরে যেতে দিন।'

'শান্ত হোন,' বললেন তারিক ভাই। 'আমার ঘরে এসে একটু বসবেন, প্লীজ? আপনার সাথে আমার কথা আছে।'

'কি কথা? বলুন, আমি শুনছি।'

'না, এখানে দাঁড়িয়ে নয়। ভেতরে আসুন,' বলে তিনি নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

অগত্যা আমাকেও ভেতরে ঢুকতে হলো।

সোফার কিনারায় বসলাম আমি। তারিক ভাই বসলেন না, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বললেন, 'কালই আমি ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি। ওখানের বাড়িটা পরিষ্কার করার জন্যে লোক লাগাব। নতুন ফার্নিচার কিনে সবগুলো কামরা সাজাতে এক হপ্তার বেশি লাগবে না। তারপর সিদ্ধান্ত নেব, বাচ্চাদের নিয়ে ওখানেই থাকব কিনা। এ-বাড়িতে আমার মন আর টিকবে বলে বিশ্বাস হয় না। প্রশ্ন হলো, বাচ্চারা ওখানে থাকলে ওদের সাথে আপনিও থাকবেন তো?'

'থাকব।'

'ধন্যবাদ। একটা চিন্তা দূর হলো। আপনাকে শুধু একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে। মায়ের কথা বাণীর প্রায় কিছুই মনে নেই। মনে আছে শুধু শক্তির। আপনার ওপর দায়িত্ব দিলাম, ওর মায়ের স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে দেবেন আপনি। কাজটা ধীরে ধীরে, সাবধানে করতে হবে, প্রচুর ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে—তবে আমি জানি, চেষ্টা করলে পারবেন আপনি।'

নিঃশব্দে কাঁদছি আমি। 'না, তারিক ভাই, সেটা উচিত হবে না···।'

'যা বলছি শুনুন, শিমুল। শক্তির ভালর জন্যেই দরকার এটা। আরেকটা কথা, ওদেরকে ফেলে চলে যাবেন না, প্লীজ। দুনিয়াটা বড় নোংরা জায়গা, সেই নোংরামি আর ওদের মাঝখানে ভাল কিছু যদি থাকে তো এক আপনিই আছেন। আজ আপনি আমাকে কথা দিন, ওদেরকে ফেলে কোনদিন যাবেন না—ওদের কথা ভেবে, আমার কথা ভেবেও।'

'আপনি ভাল করেই জানেন, তারিক ভাই···ওদেরকে আমি ভালবাসি।'

খানিক আগে যা ঘটেছে তারজন্যে আবার তিনি আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন, তারপর বললেন, 'শিমুল, আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে আমার। আমি আশা করব, আপনি আমাকে সত্যি কথা বলবেন। আপনি তো নিজের ঘরে ছিলেন, বেরুলেন কেন?'

'বেরুলাম···বেরুলাম···,' গহনার বাক্সটা এখনও আমার হাতে রয়েছে। সেটা ওঁকে দেখালাম, বললাম, '···বেরুলাম আপনার ঘরে আসব বলে।'

'কেন?'

'এটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

'ফিরিয়ে দেবেন?' তারিক ভাই অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিক। 'কেন, ফিরিয়ে দেবেন কেন?'

'আপনিই বলুন, কোন অধিকারে এত দামি জিনিস আপনার কাছ থেকে নেব আমি? আপনার এরকম বাড়াবাড়ি করা একদম উচিত হয়নি।'

'কৃতজ্ঞ প্রকাশ করার জন্যে কিছু একটা দেয়া দরকার আপনাকে, এগুলো চোখে পড়ল, তাই কিনেছি—আপনাকে ছোট বা বিব্রত করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তবু

যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন। সত্যি যদি ফিরিয়ে দিতে চান, দিন—ব্যাপারটাকে আমার একটা ভুল বলে মেনে নেব।'

'আপনি আমার ওপর রাগ করছেন, তারিক ভাই?'

'আপনার ওপর? না! আমার মনের কথা, কি ভেবেছি আপনাকে নিয়ে, এ-সব আপনাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি বলে রাগটা বরং নিজের ওপরই হচ্ছে আমার। একান্তই যদি ফিরিয়ে দিতে চান তো দিন।' কথা শেষ করে আমার সামনে হাত পাতলেন তারিক ভাই।

'না, থাক,' বলে গহনার বাক্স ধরা হাতটা নিজের পিছনে লুকালাম আমি। 'আপনার মনে আমি দুঃখ দিতে চাই না।'

সামান্য একটু হাসি ফুটল তারিক ভাইয়ের ঠোঁটে।

আমি বললাম, 'এবার আমি যাই তাহলে, তারিক ভাই?'

'এক সেকেণ্ড,' তাড়াতাড়ি বললেন উনি। 'হলরুম থেকে আপনি পালিয়ে আসার চেষ্টা করলেন, তারপর কি হলো?'

'তারপর ডাক্তার আমাকে জোর করে···না, তারিক ভাই, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না—সে আমি বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে, থাক তাহলে। শুধু বলুন, জহির ডাক্তার সবাইকে যা বলে বেড়াচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে!'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলাম। 'কি বলে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার?'

'আপনি নাকি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন।'

'অসম্ভব! তাঁকে আমি ঘৃণা করি! এ-সব কথা কাকে বলেছেন উনি?'

'মেহের আপাকে,' বললেন তারিক ভাই, চেহারাটা থমথম করছে ওঁর।

'সব মিথ্যে! আপনাকে আমি আগেও বলেছি, ওরা আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। এটা ওদের একটা নোংরা ষড়যন্ত্র!'

'কিন্তু কারণটা কি? কেন ওরা এরকম একটা মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছে?'

'ওরা···ওরা চায় না আপনার সামনে আসি আমি, আপনার সাথে কথা বলি! ওরা আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়···,' কান্নায় বুজে এল আমার গলা।

'শান্ত হোন, শিমুল, প্লীজ। আপনার কথাই আমি বিশ্বাস করছি। ওদেরকে আমি চিনি, কাজেই জানি ওদের পক্ষে এ-ধরনের নোংরা কাজ সম্ভব। ঠিক আছে, এখন থেকে আরও সাবধান হবেন আপনি—এটা আমার অনুরোধ।'

এর খানিক পর নিজের ঘরে ফিরে এলাম আমি। তারিক ভাই আমাকে সন্দেহ করেন, বুঝতে পেরে মনটা ভেঙে গেছে।

পরদিন ভোরবেলাই ঢাকায় ফিরে গেলেন তারিক ভাই। কারও সাথে দেখা করেননি, কাউকে কিছু জানিয়েও যাননি। ঈদ এল, চলেও গেল। বাড়ির পরিবেশ থমথম করছে, কারও মনে শান্তি নেই। ঈদের দিন মোরশেদ খান বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। আমাকেও যেতে বললেন তিনি, কিন্তু আমি গেলাম না।

সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসার কথা তারিক ভাইয়ের, কিন্তু ফিরলেন তো নাই-ই, একটা ফোনও করলেন না। ওঁর কথা ভেবে সাংঘাতিক উদ্বেগে আছি আমি। ঈদ হয়ে গেছে আজ দশ দিন, ওঁর কোন খবর পাচ্ছি না। তারপর ফোন করলেন, কথা বললেন শুধু শক্তি আর বাণীর সাথে। মেহের আপা কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগেই

অপরপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তারিক ভাই।

সেদিনই আমার ঘরে এসে মোরশেদ খান জানালেন, 'তোমার মেহের আপা খুব অসুস্থ বোধ করছে। জহির ডাক্তার তো আসবে না···ডা. মহসীনকে ডাকতে যাচ্ছি আমি, দেখি পাওয়া যায় কিনা। বাচ্চাদের যতটা সম্ভব সামলে রাখো, দেখবে ওরা যেন বেশি হৈ-চৈ না করে, কেমন?'

যেচে পড়ে আমি আর জানতে চাইলাম না মেহের আপার কি হয়েছে। খানিক পর দেখলাম, বয়স্ক এক ভদ্রলোককে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন মোরশেদ খান। বুঝলাম, ইনিই ডা. মহসীন। একবার ভাবলাম, যাই, মেহের আপাকে দেখে আসি। তারপর ভাবলাম, না, থাক, আমাকে উনি হয়তো এই মুহূর্তে সহ্য করতে পারবেন না। টেলিফোনে ভাই তাঁর সাথে কথা বলেননি, সেজন্যেও হয়তো আমাকে তিনি দায়ী করছেন মনে মনে। সেদিন মহিলার জন্য প্রায় একটু দুঃখই হলো আমার।

এপ্রিল পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল মে। মে মাসটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ এই মাসেই আমার দেবতা আমাকে প্রথম ও শেষ চিঠি লিখলেন। খুব বেশি কিছু কথা লেখেননি, ওঁর সব কথার অর্থও পরিষ্কার বুঝতে পারিনি আমি, তবু চিঠিটা আমার উদ্বেগাকুল অস্থির জীবনে খানিকটা শান্তি ও আশা এনে দিয়েছিল। তারিক ভাই লিখলেন:

> 'ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি কোন চিন্তা করি না, কারণ জানি আপনার কাছে আছে ওরা। বিলাসভবনের পরিবেশ এত নোংরা লাগে আমার যে আপনাদেরকে ঢাকার বাড়িতে এনে তুলতে পারলে মনে বড় শান্তি পেতাম। কিন্তু মুশকিল হলো হঠাৎ করে কোন কাজ আমি কোনদিনই করতে পারি না। জীবনে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন আনতে হলে প্রচুর সময় লাগে আমার। ইচ্ছে হয়, খুবই ইচ্ছে হয় ছেলেমেয়ে আর আপনাকে একবার দেখে আসি। শক্তি, বাণী আর আপনি, সারাক্ষণ তো শুধু এই তিনজনের কথাই ভাবি। কিন্তু চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমি কিছু করতে পারছি না। আশা করি আপনি আমাকে আরও খানিকটা সময় দেবেন। জানি, অস্বাভাবিক দেরি করে ফেলছি আমি, আপনাকে অযথা কষ্টের মধ্যে রেখেছি, তবু আমি আশা করব আমার এই দ্বিধা ও ইতস্তত ভাবটা আপনি ক্ষমা করবেন। সময় চাইছি বটে, তবে খুব বেশি সময় চাইছি না···
>
> আপনার প্রিয় তারিক ভাই।'

তারিক ভাই আমার কাছ থেকে সময় চেয়েছেন, কিন্তু বলেননি কিসের জন্যে। ব্যাপারটা অস্পষ্ট, তবে আন্দাজ করে নেয়া যায়। যদিও এ-ব্যাপারটা নিয়ে নিজেকে আমি বেশি কিছু আশা করতে দিলাম না। কিছুই ঘটেনি এখনও, কাজেই উল্লাস অনুভব করার কোন কারণ দেখি না। মনে মনে ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই এলেন তারিক ভাই। জুন মাসের ছ'তারিখ। ভোরে পৌঁছুলেন তিনি, বুঝতে পারলাম সারারাত গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। আমার সাথে একবার মাত্র দেখা হলো, বেলা দশটার দিকে। বললেন, 'আজ রাতে আপনার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।'

দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি। বিকেলের দিকে বাণী আর শক্তিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন মেহের আপা, সাথে মোরশেদ খানও গেলেন। বাড়িতে আমি একা হয়ে গেলাম। জব্বার গেছে বাজার করতে, লতা ছুটিতে, সামিনাকে কোথাও দেখছি না।

সাড়ে চারটের দিকে শরাফত মিয়া এসে জানাল, 'আপামণি, আপনার সাথে একজন কথা বলবেন।' তার সাথে থুরথুরে এক বুড়িকে দেখলাম। বুড়িকে আমার ঘরে রেখে চলে গেল শরাফত মিয়া।

বুড়ির বয়স সত্তরের কম নয়। বেশিরভাগ দাঁতই নেই, সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, তবে শরীরটা এখনও বেশ শক্ত বলে মনে হলো। প্রায় সিধে হয়েই হাঁটতে পারে। এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরে বলল, 'তুমি বোধহয় আমার বাণী আর শক্তিকে দেখাশোনা করো, তাই না মা?'

'জ্বী। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না।'

'আমি কে? আমি আকলিমা, বাণীর আকলিমা নানী। বাণী আর শক্তির মাকে তো তুমি দেখোনি, আমি শারমিনের চাচী···।'

'কি রকম চাচী?' জানতে চাইলাম আমি। 'আপনি এদিকেই কোথাও থাকেন?'

'না-মা, মিথ্যে কথা বলব কেন, তার সাথে আমার রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি বেওয়া মানুষ, যে একটু আশ্রয় দেয় বা খেতে দেয়, তারই চাচী। একা শুধু বাণী নয়, বাণীর মাকেও মানুষ করেছি আমি···।'

'আপনি থাকেন কোথায়?' বুড়ির হাত ধরে টেনে আনলাম, বসিয়ে দিলাম বিছানায়। তার পাশে আমিও বসলাম।

'থাকি মা বহু দূরে, সেজন্যেই তো আসি আসি করেও আসতে পারিনি এতদিন। তা ওদের কাউকে যে দেখছি না, মা? বাচ্চা দুটো কোথায়?'

'ওরা বেড়াতে গেছে। আপনি বুঝি ওদেরকে দেখতে এসেছেন?'

হঠাৎ চঞ্চল একটা ভাব ফুটে উঠল বুড়ির চেহারায়। 'হ্যাঁ, দেখতে তো এসেইছি, তবে জরুরী একটা কাজেও এসেছি। কবে মরে যাই না যাই, আর দেরি করা ঠিক হবে না। কিন্তু রাক্ষসীটা ফিরে আসার আগেই চলে যেতে হবে আমাকে। এটা কোন মতেই তার হাতে পড়া চলবে না। তারিক বাপজানকে একটু ডাকবে, মা?'

'কিন্তু তিনি তো বাড়িতে নেই।'

'তাহলে জিনিসটা আমি কাকে দিয়ে যাব?' বুড়ি জানতে চাইল।

'কি জনিস?' আবার জানতে চাইলাম আমি।

'কবে কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে, সব ওটার মধ্যে লেখা আছে, মা,' বলল বুড়ি। 'আমাকে দেয়ার সময় শারমিন বলল, সাবধান, অন্য কারও হাতে যেন না পড়ে—কি ঘটেছে, কিভাবে ঘটেছে সব আমি এতে লিখে রেখেছি। আরও বলল, একদিন হয়তো তোমার তারিক বাবাজীকে সব জানাবার দরকার হবে। তখন তুমি এটা তার হাতে তুলে দিয়ো।'

'কি জিনিস?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলাম আমি। 'ডায়েরী নাকি?'

'হ্যাঁ, মা, ডায়েরী। রাক্ষসীটা আমাকে যখন এ-বাড়ি থেকে বের করে দিল, তারিক বাপজান তখন ঢাকায়। তাই ওটা আমি তাকে দিয়ে যেতে পারিনি। বুড়ি মানুষ, সেই পটিয়া থেকে আসছি···,' হঠাৎ থেমে আমার হাতঘড়ির দিকে তাকাল বুড়ি। '···ক'টা বাজে বলো তো, মা? আমাকে তো আবার বাস ধরতে হবে···।'

বললাম, 'পাঁচটা বাজতে আর বেশি বাকি নেই।'

এরপর আর বসল না বুড়ি। শরাফত মিয়া আশপাশেই ছিল, সে-ই এসে তাকে নিয়ে

গেল, বলল, রিকশায় তুলে দিয়ে এখুনি ফিরে আসবে। ডায়েরীটা টেবিলের দেরাজে ভরে রেখে সুটকেস খুললাম আমি, পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে বুড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরলাম, বললাম, 'আপনার গাড়ি ভাড়াটা নিয়ে যান।'

কিন্তু বুড়ি টাকাটা নিল না। চোখ ভরা পানি, বাণী আর শক্তিকে দেখতে পেল না বলে দুঃখ করতে করতে চলে গেল। ওদের সাথে বাড়ির বাইরে পর্যন্ত এলাম আমি, দেখলাম ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটা পথ ধরে পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে আকলিমা বুড়ি। খানিক পরই ফিরে এলাম নিজের ঘরে। রুমাল বের করার জন্যে টেবিলের দেরাজ খুলেছি, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ভেতরে। এইমাত্র রেখে গেছি, সে জিনিস যাবে কোথায়?

পরিষ্কার মনে আছে আমার, টেবিলের দেরাজেই রেখেছি ডায়েরীটা। তাহলে? কেন জানি না হঠাৎ মনে হলো, সামিনাকে জিজ্ঞেস করা দরকার। তার খোঁজে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কিচেনে ঢুকে দেখি, ফল থেকে রস বের করছে সে। জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্যে? বলল, বেগমসাহেবার জন্যে। তারমানে, বুঝতে পারলাম, আমি যখন বুড়ির সাথে কথা বলছি তখনই ফিরে এসেছেন মেহের আপা। জিজ্ঞেস করলাম, বাচ্চারা কোথায়? সামিনা আমার দিকে তাকাচ্ছে না, বলল, তারা বাগানে।

তারপর তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নীল চামড়া দিয়ে মোড়া একটা নোটবুক হারিয়েছে আমার ঘর থেকে। তুমি দেখেছ না কি?'

চেহারাই বলে দিল, সে-ই অপরাধী। কিন্তু ভুরু কুঁচকে, ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল, 'আমি কখনও আপনার ঘরে যাই না!'

'যাও না মানে? সব সময় আমার ঘরে যাওয়া-আসা করছ তুমি!'

আমাকে পাশ কাটিয়ে, প্রায় ধাক্কা দিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল সামিনা। 'বেগমসাহেবাকে বলছি, আপনি আমাকে শুধু শুধু সন্দেহ করছেন।'

রাগে দিশেহারা হয়ে গেলাম। ছুটে আমিও বেরিয়ে এলাম কিচেন থেকে, সামিনার আগেই ঢুকে পড়লাম মেহের আপার কামরায়। দরজায় নক করলাম, তবে সাড়া পাবার অপেক্ষায় না থেকে দরজা ঠেলে সরাসরি ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

ঢুকেই বুঝলাম, আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। ড্রেসিং টেবিলের পাশে, উজ্জ্বল একটা আলোর নিচে হুইলচেয়ারে বসে রয়েছেন মেহের আপা। শারমিন সুলতানার ডায়েরীটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন তিনি।

'কোন সাহসে তুমি আমার ঘরে ঢুকলে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

হঠাৎ সমস্ত ভয় কাটিয়ে উঠলাম আমি। বুঝলাম, ভয় পেলে ডায়েরীটা উদ্ধার করা যাবে না। দৃঢ়তার সাথে বললাম, 'বুড়ির সাথে আমার কি কথা হয়েছে, আড়িপেতে শুনেছেন আপনি। তারপর সামিনাকে বলেছেন, ডায়েরীটা চুরি করে আনতে। এ-ধরনের একটা কাজ আপনি করতে পারলেন?'

'বেশ, আনিয়েছি তো কি হলো?' মেহের আপার চোখ দুটো সাপের মত চকচক করছে। 'আমার ভাইয়ের বউয়ের লেখা ডায়েরী তোমার কাছে থাকবে কেন?'

'আমার কাছেই থাকবে, কারণ আমাকে ওটা দিয়ে যাওয়া হয়েছে,' বললাম। 'দিন, আমাকে ওটা ফিরিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি, ওটা আমি পড়ে দেখব না। যাকে দেয়ার কথা সে এলে তাঁর হাতে তুলে দেব।'

'এখনও আমার পড়া শেষ হয়নি!' লক্ষ করলাম, নোটবুক ধরা তাঁর হাতটা কাঁপছে। 'যতটুকু পড়েছি, সবই দেখছি মিথ্যে কথা লিখে রেখে গেছে। বেচারা জহিরের বিরুদ্ধে

ভিত্তিহীন সব অভিযোগ। স্বামীর কাছে নিজেকে সতী বানাবার চেষ্টা। যত দোষ সব নাকি আমার আর জহিরের···।'

'কার দোষ না দোষ, আমি তা জানতে চাই না। তবে আমার ধারণা, ডায়েরীটা পড়লে তারিক ভাইয়ের কিছু ভুল ধারণা ভেঙে যাবে।'

হঠাৎ উন্মাদিনীর মত খিলখিল করে হেসে উঠলেন মেহের আপা। 'এটা তাকে আমি দিলে তো!' হাসির ফাঁকে বললেন তিনি। 'পড়বে কিভাবে?'

'দেবেন না মানে?' মেহের আপার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

'দেব না, দেব না! ছিঁড়ে ফেলব!' বলেই নোটবুকটা খুললেন তিনি, দু'হাতে ধরে ছিঁড়তে শুরু করলেন।

আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করলাম। এই ডায়েরীটা তারিক ভাইয়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, মিথ্যে সন্দেহ থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পাবেন তিনি। সেটা আমার চোখের সামনে শয়তান মেয়েলোকটা ছিঁড়ে ফেলছে দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ছুটে গিয়ে নোট বুকটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। মেহের আপা চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে ডায়েরীটা দু'ভাগ করে ফেলেছেন তিনি। পাতাগুলো ধরে ছিঁড়তে যাচ্ছেন দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড ধস্তাধস্তি করার পর যখন দেখলাম তাঁর সাথে আমি পারছি না, বাধ্য হয়ে হুইলচেয়ারে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলাম। ধাক্কা দিয়ে আমি আসলে চেয়েছিলাম চেয়ারটাকে ঘোরাতে। কিন্তু ঘটে গেল একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা। ধাক্কাটা খুব জোরের সাথে দিয়েছিলাম, চেয়ারটা উল্টে গেল। চেয়ার সহ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মেহের আপা, তাঁর মাথা ঠুকে গেল ড্রেসিং টেবিলের শক্ত পায়ার সাথে।

তারপরই শোনা গেল তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার।

মাত্র একবার, তারপরই অসাড় হয়ে গেলেন মেহের আপা।

চিৎকার শুনে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল সামিনা। তারপর সে-ও আর্তনাদ করে উঠল, ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। 'দুলাভাই! মেরে ফেলল! বেগমসাহেবাকে মেরে ফেলল! দুলাভাই সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশ হয়ে গেছে···।'

কাঁপা হাতে মেহের আপার পালস পরীক্ষা করলাম। কিছুই অনুভব করলাম না। আতঙ্কে কান্না পেল আমার। উনি যদি মারা গিয়ে থাকেন, নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে আমার। কাঁদতে কাঁদতেই মেহের আপার বুকে মাথা রাখলাম আমি, তাঁর বুকে কান চেপে ধরে শোনার চেষ্টা করলাম হার্ট সচল আছে কিনা। এতক্ষণে বুঝলাম, বেঁচে আছেন। তারপর যা ঘটল, ভীতিকর দুঃস্বপ্ন বললেই হয়। একটু পরই লোকজনে ভরে গেল কামরাটা।

ধীরে ধীরে দাঁড়ালাম আমি। বুঝলাম, এখন আমাকে শক্ত হতে হবে। শরাফত মিয়াকে ছাড়া বাকি সবাইকে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম। তার সাহায্যে মেহের আপাকে তুলে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। প্রৌঢ় শরাফত মিয়া থর থর করে কাঁপছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, মেহের আপার কপাল ও মাথা, দু'জায়গায় কেটে গেছে। কপালের মাঝখানটা ফুলেও উঠেছে আলুর মত। ক্ষত দুটো থেকে রক্ত বেরুচ্ছে এখনও। দরজা খুলে লতাকে ডাকলাম, বললাম, 'ডা. মহসীনকে টেলিফোন কর, বল এখুনি যেন চলে আসেন।'

মেহের আপা চোখ খুলছেন না। এখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন।

লতা ফিরে এসে রুদ্ধশ্বাসে জানাল, ডা. মহসীন বাড়িতে নেই, দূরে কোথাও কলে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। ইতিমধ্যে মেহের আপার বালিশ ও বিছানা রক্তে ভিজে

গেছে। দিশেহারা বোধ করলাম। শরাফত মিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, সে জানাল এদিকে আর কোন ডাক্তার নেই। এরপর স্বভাবতই জহির ডাক্তারকে ডাকার কথা ভাবতে হলো আমাকে। কোন উপায় দেখছি না, এ-বাড়িতে আবার তাকে ডেকে আনতে হবে।

খবর পেয়েই ডাক্তারী ব্যাগ হাতে শরাফত মিয়ার সাথে চলে এলেন তিনি। বিছানায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকা মেহের আপার দিকে একবার তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন, তারপর তাকালেন আমার দিকে, ইতিমধ্যে মেহের আপার হাতটা তুলে নিয়ে পালস দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর দৃষ্টি দেখে মনে হলো, ব্যাখ্যা দাবি করছেন।

বললাম, 'আপনি আপনার রোগিণীকে দেখুন। পরে সব জানবেন। প্রথমে আপনি রক্ত পড়া বন্ধ করুন।'

আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামিনা, হঠাৎ কেঁদে উঠে সে বলল, 'বেগমসাহেবাকে উনি খুন করতে চেয়েছিলেন।'

জহির ডাক্তারের ঠোঁটে ক্ষীণ, বাঁকা একটু হাসি ফুটল। 'এখন কে তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে বলো তো?'

চেষ্টা করলাম তারিক ভাইকে খবর দেয়ার। কয়েক জায়গায় ফোন করা হলো, কিন্তু কোথাও ওঁকে পাওয়া গেল না। বাড়ির কেউ বলতে পারল না কোথায় তিনি গেছেন বা কখন ফিরবেন।

ক্ষত দুটো থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হলো। মেহের আপার মাথায় ও কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন জহির ডাক্তার। রোগিণীর পাশেই বসে থাকলেন তিনি, আমাকে বললেন, 'এবার বলো তো শিমুল, নিজের পায়ে এভাবে তুমি কুড়ুল মারতে গেলে কেন?'

কথা না বলে মেহের আপার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। করিডরে দেখা হয়ে গেল মোরশেদ খানের সাথে। বাচ্চাদের নিয়ে এইমাত্র বাড়ির পিছন থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। বাণী ও শক্তিকে তাদের নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিলাম আমি, বললাম লতা ওদেরকে নাস্তা খাওয়াবে। বাচ্চারা চলে যাবার পর মোরশেদ খানকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খানিকটা আভাস দিলাম আমি।

বাড়িতে জহির ডাক্তারকে ডেকে আনিয়েছি শুনে রাগ করলেন উনি, বললেন, 'তুমি জানো তারিক তাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে মানা করে দিয়েছে···।'

'সব কথা পরে আমি ব্যাখ্যা করব,' তাঁকে বললাম। 'যা ঘটেছে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আপনি মেহের আপার কাছে যান।'

হন্তদন্ত হয়ে নিজেদের ঘরের দিকে ছুটলেন তিনি।

নিজের ঘরে ঢুকে শারমিন সুলতানার ডায়েরীটা সুটকেসে ভরলাম। তালা দিলাম সুটকেসে, চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম করিডরে। অস্থির লাগছে, নার্ভাস বোধ করছি। কি করব, কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। ভাবলাম, বাড়ির বাইরে, খোলা বাতাসে একটু হাঁটি। মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।

করিডরে আবার দেখা হয়ে গেল মোরশেদ খানের সাথে। রাগে কাঁপছেন তিনি। আমাকে দেখেই বললেন, 'নিজেকে তুমি কি মনে করো? আমার স্ত্রী বলছে, তাকে তুমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ! এত সাহস তোমার? রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছি আমি!'

তাঁর দৃষ্টি সহ্য করতে পারলাম না, অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মোরশেদ ভাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে একটু একা থাকতে দিন। তারিক ভাই ফিরে আসুন, আমার যা বলার ওঁকেই বলব আমি।'

খোলা বাতাসে মিনিট দশেক হাঁটাহাঁটি করার পর মাথার ব্যথাটা সামান্য কমল। হাতে ব্যাগ নিয়ে একটু পরই বাইরে বেরিয়ে এলেন জহির ডাক্তার। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। তবে আজ আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলাম না।

'মেহের আপা ঘুমাচ্ছেন। প্রচুর রক্ত ঝরেছে, তবে আঘাত ততটা গুরুতর নয়। কাল সকালে ঘুম ভাঙার পর অবশ্য ব্যথা পাবেন, তখন আবার পেন কিলার খাওয়াতে হবে।' তারপর তিনি হেসে উঠলেন। 'ধাক্কাটা তুমি খুব জোরেই দিয়েছ, সন্দেহ নেই। কি নিয়ে ঘটল ব্যাপারটা?'

হঠাৎ ভাবলাম, জহির ডাক্তারকে খানিকটা ভয় দেখানো দরকার। বললাম, 'আকলিমা চাচীকে চেনেন তো, শারমিন সুলতানার আত্মীয়া?'

'হ্যাঁ, চিনি···কিন্তু বুড়ি তো বিদায় নিয়ে চলে গেছে কবেই!'

'আজ এসেছিল। আমাকে শারমিনের লেখা একটা ডায়েরী দিয়ে গেছে। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তার জীবনে যা যা ঘটেছে সব ওটায় লেখা আছে।'

'ডায়েরী? শারমিনের ডায়েরী?' আতঙ্কিত দেখাল জহির ডাক্তারকে। 'কোথায় সেটা?'

'আমার কাছে। তারিক ভাইকে দেব বলে লুকিয়ে রেখেছি। ওতে আপনার ও মেহের আপা সম্পর্কে অনেক কথা লিখে রেখে গেছে শারমিন।'

'কি আশ্চর্য! এতদিন পর তার ডায়েরী এল কোত্থেকে!' জহির ডাক্তার তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দিকে এগোল।

পিছন থেকে বললাম, 'কি হলো, হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পালাচ্ছেন কেন? বিপদে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করবেন না?'

গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালেন জহির ডাক্তার। ধীরে ধীরে আমার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমি পালাচ্ছি না, সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াবার চেষ্টা করছি। যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাই, তোমাকে সত্যি আমার ভাল লাগে। যদি কখনও সিদ্ধান্ত পাল্টাও, আমার সাথে দেখা কোরো। তোমাকে আমি সত্যিই বিয়ে করতে চাই।'

'আপনি একটা ছোটলোক!' বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ছয়

রাত আটটা বাজল। বাচ্চাদেরকে খেতে বসালাম। তারপর ওদেরকে শুইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। দুটো ডিসপিরিন খেতে মাথার ব্যথাটা কমল।

দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। কেন করলাম জানি না। বোধহয় ডায়েরীটা পড়ার জন্যে। এমনও তো হতে পারে, ডায়েরীতে হয়তো এমন সব কথা লেখা আছে যা পড়লে তারিক ভাইয়ের অশান্তি আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে ডায়েরীটা ওঁকে পড়তে দেয়া উচিত হবে না। আমি চাই না ওঁর যন্ত্রণা আরও বাড়ুক।

কাজেই তারিক ভাইয়ের আগে আমারই ওটা পড়া উচিত।

সুটকেস খুলে কাঁপা হাতে নোটবুকটা বের করলাম। কান-পাতলাম। না, কোথাও

কোন শব্দ নেই। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আছে, থমথম করছে পরিবেশ।

খুললাম নোটবুকটা। গোটা গোটা অক্ষরে প্রথম পাতায় শারমিন সুলতানা লিখেছে—

'বারোই মে। আজ শক্তির জন্মদিন। বিরাট পার্টির আয়োজন করা হয়েছে বিলাসভবনে। ঢাকা থেকে একদিনের জন্যে প্লেনে করে এল তারিক, কালই আবার চলে যাবে। পার্টি চলছে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করে সব ভণ্ডুল করে দিল মেহের আপা। চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল, বলল আমি নাকি তাকে যাচ্ছে তাই বলে অপমান করেছি। ডাহা মিথ্যে কথা। আমি শুধু হালকা সুরে বলেছিলাম, শক্তিকে বেশি আদর দিয়ো না, মেহের আপা। এক সময় দেখবে, ও তোমার কথাও শুনছে না। ব্যস, এইটুকু। আমার নিজের ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখেও আমি কিছু বলতে পারব না? এ-সব কথা তারিককে আমি খুলে বলতে পারি না। বোনকে সাংঘাতিক ভালবাসে সে।

মেহের আপা নেহাতই দজ্জাল মহিলা। তারিক আমাকে ভালবাসে, এটা তিনি একদমই সহ্য করতে পারেন না। প্রকাশ্যেই বলছেন, তাঁর কাছ থেকে তারিককে আমি কেড়ে নিতে চেষ্টা করছি। আশ্চর্য ব্যাপার, ও আমার স্বামী, আমাকে ও ভালবাসবে না? কেন যেন ভয় হয় আমার, মেহের আপা আমার সাংঘাতিক একটা ক্ষতি করে ফেলবেন।'

পরের পাথায় লিখেছে—

'ছাব্বিশে মে। তারিক দিনের পর দিন ঢাকায় থাকছে, একা আমার আর ভাল লাগে না। মেহের আপার পুরুষ বন্ধুর অভাব নেই, রোজই তারা বিলাসভবনে আসছে। মেহের আপার জন্যে আসছে, নাকি আমার জন্যে, বলা মুশকিল। রূপ নিয়ে আমি একটা বিপদেই পড়েছি, যে দেখে সে-ই আমার প্রেমে পড়ে যায়। তারিক, আমাকে এভাবে একা ফেলে রাখতে তোমার ভয় করে না? মাসের পর মাস ব্যবসার কথা বোলে, গানের কথা বোলে ঢাকায় থাকছ তুমি—যদি বলি আমাকে তুমি অবহেলা করছ, দোষ দিতে পারবে?'

দু'দিন পরই শারমিন লিখেছে—

'মেহের আপা আর মোরশেদ ভাই বিলাসভবনে আছে একটানা আজ ছ'মাস। এই ছ'মাস ধরে আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি। কাল তিনি আমাকে বলেছেন, তারিক আসলে আমাকে ভালবাসে না, তা বাসলে বউকে ফেলে এভাবে ঢাকায় পড়ে থাকত না।'

'ত্রিশে মে। পরিস্থিতি দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে। তারিক বাড়িতে ফিরল, ওকে দেখিয়ে আমার সাথে হাসিমুখে কথা বললেন মেহের আপা। কিন্তু তারিক চলে যেতেই আমাকে যা-তা বলে অপমান করতে শুরু করলেন, কোন কারণ ছাড়াই। শক্তিকে নিজের কাছে আটকে রাখেন উনি, আমার কাছে প্রায় আসতেই দেন না। কিন্তু বাণীকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।'

'দশই জুন। সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে ভারত সফরে গেল তারিক। আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে দেখবে! শেষ পর্যন্ত না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। নিঃসঙ্গ লাগছে। বাড়িতে কারও সাথে কথা বলতে পারি না। এক শুধু আকলিমা চাচী আমার দুঃখ বোঝে। কিন্তু চাচীকে কতদিন এ-বাড়িতে রাখতে পারব জানি না। মেহের আপা পারলে আজই তাকে বিদায় করে দেন। সামিনা ছাড়া মেহের আপাকে কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু বাকি সবাই যমের মত ভয় পায় তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এ-বাড়ির কারও নেই।'

'বিশে জুন। মেহের আপার নতুন ডাক্তার বন্ধুটি, জহিরউদ্দিন, খুব মজার লোক।

ডাক্তার হিসেবেও বোধহয় ভাল সে। প্রথমে তাকে আমার পছন্দ হয়নি। তার আচরণে কেমন যেন একটা গায়ে পড়া ভাব। কিন্তু পরে দেখলাম, আমার নিরানন্দ জীবন সম্পর্কে সচেতন সে। আমার প্রতি তার সহানুভূতি আছে দেখে ভাল লাগল। আগে দেখা হলে কথা বলতাম না, আজকাল বলি। একদিন মেলায় দেখা হলো, জোর করে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে কাটলেট আর চা খাওয়াল আমাকে। পরে জানতে পারলাম, কথাটা মেহের আপার কানেও গেছে। শুনে আশ্চর্য হলাম, মেহের আপা রাগ করেননি। বরং হেসেছেন। এরপর আরও কয়েকবার মেলায় গেলাম আমরা—ডাক্তার আর আমি। সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়—বেড়াতে। বলেছি যাব একদিন।'

'সাতই আগস্ট। কাল রাতে আমার সাথে অসম্ভব ভাল ব্যবহার করলেন মেহের আপা। আমাকে ডেকে বললেন, তিনি আমার দুঃখ বোঝেন। এখন থেকে তিনি নাকি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। তারিক আমার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ব্যবসাকে, সেজন্যে ভাইয়ের ওপর অসন্তুষ্ট তিনি। মেহের আপার কথা শুনে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি আমি—তারিক কি আর কাউকে ভালবাসে? তা না হলে আমাকে এত কেন অবহেলা করে সে?'

'সাতাশে আগস্ট। তারিক আবার ঢাকায় ফিরে গেছে। তবে আমার সময় ভালই কাটছে বিলাসভবনে। এখন আর নিজেকে আমার একা মনে হয় না। ডাক্তার জহির আসলে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। বলা যায়, হাবুডুবু খাচ্ছে। কাল আমাকে সে বলল, আমাকে আপন করে না পেলে সে নাকি মারা যাবে। শুনতে ভালই লাগে। অন্তত তার সঙ্গটুকু সত্যি উপভোগ করি আমি। তার বক্তব্য, আমরা দু'জন বন্ধু হলে মেহের আপাও নাকি আপত্তি করবেন না, কারণ তিনিও জানেন যে তাঁর ভাইটি আমাকে অবহেলা করছেন। বাচ্চাদের নিয়ে ঈদগাঁও এসেছি কাল, গাড়ি নিয়ে আজ হাজির হলো ডাক্তার। বলল, আমাকে না দেখে থাকতে পারছিল না। পুরো হপ্তাটা আমাদের এখানে থাকতে চাইছে সে। বলছে, মেহের আপার অনুমতি নিয়েই এসেছে। রাত এখন দুটো বাজে, এইমাত্র নিজের ঘরে ফিরে গেল ডাক্তার। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, দু'জনে গল্প করছিলাম। নারী ও পুরুষ একা হলে যা হয়, ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছিল। এ-ধরনের আচরণ করতে তাকে আমি বারণ করে দিয়েছি। ঠেলে সরিয়ে দেয়ার সময়ও হাসছিল সে। বলল, তার প্রতিজ্ঞা, আমার ভালবাসা একদিন নাকি সে আদায় করবেই। আর সেদিন আমাকে চুমো খাবে সে। শুনে হেসেছি আমি।'

'পনেরোই সেপ্টেম্বর। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করার পর ঘাবড়ে গেছি আমি। ডাক্তারের সাথে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়া উচিত হচ্ছে না আমার। মেহের আপার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলাম, কিন্তু উনি আমার সব কথা না শুনেই বললেন, ডাক্তারকে তিনি ভাল লোক বলে জানেন। পরিবারের এরকম একজন শুভানুধ্যায়ী থাকা দরকার। বললেন, আমার প্রতি ডাক্তার যদি সহানুভূতি দেখায়, তাতে আমার মনে করার কিছু নেই। ডাক্তারের বন্ধুত্ব ধরে রাখার জন্যে আমার নাকি আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার।'

'বিশে সেপ্টেম্বর। প্রায় একমাস পর ডায়েরী লিখতে বসেছি আজ। দিনগুলো খুব ভীতিকর ছিল। আজ আমি বুঝতে পারছি, মেহের আপা একটা বিষধর সাপ। দিনের পর দিন তিনি আমাকে বুঝিয়ে এসেছেন, আমি কোন অন্যায় করছি না, ডাক্তারের সাথে আরও ভাল ব্যবহার করা উচিত আমার। তারপর হঠাৎ একদিন ডাক্তার আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিল, এবং সেজন্যে আমাকেই উনি দায়ী করলেন। আমি নাকি তার সাথে ভাল ব্যবহার

করি না, সেজন্যেই সে অভিমান করে আসছে না। আমি বললাম, এ-বাড়িতে ডাক্তারের আসা আমি বন্ধ করতে চাইনি, আমি শুধু চেয়েছি, সে যেন কোন রকম বাড়াবাড়ি না করে—কারণ আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি। আকলিমা চাচীর কথায় চোখ খুলে গেছে আমার। চাচীই আমাকে বলেছে, ডাক্তারের উদ্দেশ্য ভাল না। যদিও সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তারকে এখনও আমার ভাল লাগে। কিন্তু ইদানীং বারবার আমার গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করছিল সে, সেজন্যে বাধ্য হয়ে বলে দিয়েছি, তার এ স্বভাব তাকে বদলাতে হবে, তা না হলে আমাদের দেখা না হওয়াই ভাল। মেহের আপা এটার অর্থ করেছেন, ডাক্তারকে আমি বিলাস-ভবনে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছি। পুরো একটা হপ্তা আমার জীবন নরক করে তুললেন তিনি। তারপর একটা চুক্তি হলো তাঁর সাথে। তিনি আমাকে চিঠি লিখতে বললেন ডাক্তারকে। আমি চিঠি লিখে ডেকে না পাঠালে সে নাকি বিলাসভবনে আসবে না। কি লিখতে হবে তা-ও মেহের আপা বলে দিলেন আমাকে। তার কথা মত আমাকে লিখতে হল, আমি অন্যায় করেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই। আরও লিখতে হলো, তার অভাব বোধ করছি ভীষণভাবে, চিঠি পেয়েই সে যেন আমাকে দেখার জন্যে চলে আসে। ঘটলও তাই। চিঠি পেয়েই চলে এল ডাক্তার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তাকে দেখে আমারও মনটা খুশি হয়ে উঠল। বোকার মত তাঁকে বসিয়ে খাওয়ালাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলাম। আজও আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল সে। রাগ করে আবার না চলে যায়, এই ভয়ে খুব একটা বাধা দিতে পারলাম না। তখন আমার মনে হচ্ছিল, আচ্ছা, ডাক্তারকে আমিও এক-আধটু ভালবাসি কিনা! সেই দুর্বল মুহূর্তে ডাক্তার আমাকে চুমো খেল। এখন বুঝতে পারছি, আমি একটা বোকা। আমার মত বোকা বোধহয় ভূ-ভারতে আর একটিও নেই। স্বামী ছাড়া জীবনে কাউকে কোনদিন আমি ভালবাসিনি, ভালবাসতে পারব না··· ।'

'দোসরা অক্টোবর। জানি না আজ যা লিখতে যাচ্ছি তা লেখার সাহস আমি কোত্থেকে পাচ্ছি। লজ্জায়, নিজের ওপর ধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। আজকের এই লেখা শেষ হলে বেশি কিছু লেখার থাকবে না আমার। বুঝতে পারছি, সবকিছুর সমাপ্তি টানার সময় হয়েছে। নিজের ভুলে জীবনটা নষ্ট করেছি আমি, উদ্ধার পাবার কোন পথই আর খোলা নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মেহের আপা নিজে একটা মেয়ে হয়ে কিভাবে পারলেন আরেকটা মেয়ের জীবন ধ্বংস করে দিতে! তা-ও পর কেউ নন, তারিকের আপন বোন তিনি, আমি তাঁর ভাইয়ের বিয়ে করা স্ত্রী! এখন আমি জানি, প্রথমে তিনি আমার বিশ্বাস অর্জন করেন, তারপর আমার বোকামির সুযোগ নিয়ে সর্বনাশা ফাঁদটা পাতেন। তিন দিন ধরে ডাক্তারের কোন খবর নেই, আমাকে মেহের আপা বললেন, শপিং করতে যাচ্ছ, ফেরার পথে জহিরের বাড়িতে একবার ঢু মেরে এসো। ছেলেমেয়েরা বাড়িতেই থাক, ওদেরকে আমি দেখব। ডাক্তারকে ক'দিন না দেখে আমারও খারাপ লাগছিল, কাজেই খুশি মনে রাজি হলাম। ফেরার পথে ঢুকলাম ডাক্তারের বাড়িতে। আমাকে দেখে আনন্দে পাগলামি শুরু করল ডাক্তার। কিছু না খাইয়ে কোনমতে আমাকে ছাড়বে না। অগত্যা তার বৈঠকখানায় বসতে হলো। বাড়িতে চাকরবাকর কেউ নেই, ডাক্তার একা। অথচ বাজার থেকে কেনা এক গাদা নাস্তা এনে হাজির করল আমার সামনে। তারপর নিজেই কফি বানিয়ে খাওয়াল। এখন আমি জানি, মেহের আপা ডাক্তারকে আগেই ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি তার কাছে আসছি। আরও জানি, আমাকে খেতে দেয়া কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। ষড়যন্ত্রটা যে দু'জন মিলেই করেছে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'কফি খাওয়ার পর কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল মাথাটা। সোফায় বসে

ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও বলতে পারব না। ঘুম ভাঙার পর দেখি, সোফায় শুয়ে আছি আমি, ডাক্তার আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে চুমো খাচ্ছে। সেই সাথে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ক্যামেরার শাটার টানার শব্দ। এখন বুঝতে পারি, ক্যামেরেটা কয়েক ফুট দূরে লুকিয়ে রেখেছিল সে, ছবি তোলা হয়েছে অটো-তে। ছবিটা পরদিন বিকেলে দেখলাম আমি। মেহের আপাই দেখালেন আমাকে। তাঁর হাতে নিজের অশ্লীল ছবি দেখে মাথাটা আমার ঘুরে উঠল। এ ছবি কিভাবে তোলা হলো, জানতে চাইলাম আমি। মেহের আপা সব ব্যাখ্যা করে বললেন আমাকে। বললেন, এতদিনে তিনি একটা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছেন। জানতে চাইলাম, তারমানে? নিষ্ঠুর হাসি হেসে তিনি আমাকে বললেন, তারিক বাড়িতে এলেই ছবিটা তাকে দেখাবেন উনি। তাকে তিনি বলবেন, আমি দুশ্চরিত্রা। জিজ্ঞেস করলাম, তাতে আপনার লাভ? মেহের আপা হাসলেন, বললেন, আমি চাই তারিক তোমাকে ডিভোর্স করুক। আমি বললাম, এটা যে একটা নোংরা ষড়যন্ত্র, তারিককে আমি তা বোঝাতে পারব। ডাক্তারকে আমি আমার পক্ষে সাক্ষী দিতে রাজি করাব। মেহের আপা বললেন, ডাক্তার নিজের দোষ স্বীকার করবে কোন দুঃখে? তাছাড়া, আমার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পাচ্ছে সে, এই টাকা তার দরকার। জুয়া খেলে অনেক টাকা হেরে গেছে সে, আমি যা বলব তাই তাকে শুনতে হবে।'

'তেসরা অক্টোবর। শোবার ঘরে সারা রাত পায়চারি করেছি। ভোরে, এই খানিক আগে আমাকে এক কাপ চা দিয়ে গেল আকলিমা চাচী। চাচীকে বলে রাখলাম, আমার যদি কিছু ঘটে, সে যেন বাচ্চাগুলোকে দেখে। ভয় পেয়ে গেল চাচী, জানতে চাইল কি ঘটবে? আমি কোন উত্তর দিইনি। উত্তর জানা থাকলে তো দেব। আমি শুধু জানি, একটু পরই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। রাঙ্গামাটিতে আমার বড় বোন আছে, ভাবছি ও দিকেই যাব। কিন্তু ওখানে আমার আদৌ পৌঁছুনোর ইচ্ছে আছে কিনা নিজেও জানি না। আসলে আমি বিলাসভবন থেকে যতটা দূরে সম্ভব সরে যেতে চাইছি। কারণ তারিকের মুখোমুখি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ডায়েরীটা আকলিমা চাচীকে দিয়ে যাব, বলব যত্ন করে যেন রেখে দেয়। আমার কিছু হলে এই ডায়েরী সে তারিকের হাতে তুলে দেবে। যাবার আগে, তারিক, তোমাকে শুধু একটা কথাই বলে যাই—বিশ্বাস করো, আমি অসতী নই। ওরা দু'জন আমাকে নষ্ট করেছে। এ বিশ্বাস আমার আছে, একদিন তুমি সব কথা জানতে পারবে এবং সেদিন তুমি আমাকে ক্ষমা না করে পারবে না। তোমার প্রতি একটাই অনুরোধ আমার, আমার বাণী ও শক্তির যেন কোন অযত্ন না হয়। বিদায়, তারিক। বিদায়।'

বিছানায় বসে থরথর করে কাঁপছি আমি। মানুষের ভেতর এত পাপ থাকতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

বোধহয় তারিক ভাই বাড়িতে ফিরলেন। কলিংবেলের আওয়াজ শুনলাম। বিছানা থেকে নড়লাম না, ডায়েরীটা হাতে নিয়ে বসে থাকলাম।

মনে হলো করিডর দিয়ে, আমার ঘরের সামনে দিয়ে কারা যেন দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল। একটু হৈ-চৈ মত শুনলাম।

নিস্তব্ধ বাড়ি আবার যেন জেগে উঠেছে। মোরশেদ খানের গলা পেলাম একবার, কাকে যেন জোর গলায় ঢাকলেন। তারপর শুনতে পেলাম তারিক ভাই কাকে যেন ধমক দিলেন, 'তুমি চুপ করো!'

ঘামতে শুরু করলাম আমি। আবার নতুন করে কিছু শুরু হলো নাকি! মেহের আপা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কি করব বুঝতে পারছি না। এভাবে আরও প্রায় আধ ঘণ্টা

কাটল। কলিংবেলের আওয়াজ শুনলাম আবার। বাড়ির ভেতর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। আর স্থির থাকতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে নামতে যাচ্ছি, এই সময় নক হলো আমার দরজায়।

দরজা খুলে দেখি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির প্রায় সব চাকরবাকর। 'আপামণি,' শরাফত মিয়া মাথা নিচু করে বলল আমাকে। 'বেগম সাহেবাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আপনি যাবেন?'

'ক্লিনিকে? ক্লিনিকে কেন?'

'ওঁনার অবস্থা ভাল না···।'

আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। মেহের আপা কি মারা যাবেন? 'অবস্থা ভাল না···কেন, কি হয়েছে?'

শরাফত মিয়ার পিছন থেকে সামিনা বলল, 'এত করে বলছি পুলিশে খবর দেন, কিন্তু কেউ আমার কথা কানে তুলছে না!'

শরাফত মিয়া বলল, 'অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছে বেগম সাহেবাকে। সাহেব জানতে চাইলেন, আপনিও ক্লিনিকে যাবেন কিনা।'

'হ্যাঁ, যাব,' বলে ডায়েরীটা বিছানার তলায় রেখে ছুটে বেরিয়ে এলাম করিডরে, সবার আগে হলরুম হয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেখি, আমার জন্যে ওঁরা অপেক্ষা করেননি, অ্যাম্বুলেন্স রওনা হয়ে গেছে। অ্যাম্বুলেন্সের পিছু পিছু তারিক ভাইয়ের গাড়িটাও যাচ্ছে।

হতাশায় মুষড়ে পড়লাম। শরাফত মিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে দেখে ছুটে গেলাম তার সামনে। জানতে চাইলাম, 'হঠাৎ কি এমন হলো যে মেহের আপাকে ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হচ্ছে?'

'সাহেব বাড়িতে ফেরার পর ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠেন বেগম সাহেবা। ডাক্তার মহসীনকে ডেকে আনি আমি। তিনি দেখে বললেন, হিস্টিরিয়া। চিৎকার থামছিল না, তাই ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন উনি···।'

'কি ঘটেছে সব শোনানো হয়েছে তারিক ভাইকে?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না, আপামণি,' বলল শরাফত মিয়া। 'তবে বেগমসাহেবা চিৎকার করছিলেন···মনে হয় বিকেলের ঘটনাটাই শোনাতে চাইছিলেন সাহেবকে। আপনি নাকি তাঁকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছেন···।'

এমন অস্থির হয়ে আছি, মাথাটা কাজ করছে না। পাগলের মত লাগছে নিজেকে, কি করব বুঝতে পারছি না। শরাফত মিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন ক্লিনিকে গেলেন ওঁরা, তুমি জানো?'

'জ্বী, জানি। সিটি ক্লিনিকে।'

'শরাফত মিয়া, আমার একটা উপকার করবে তুমি? ওখানে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'আপনি যাবেন? বেশ তো, চলুন না আপামণি।'

ড্রাইভার তার ঘরেই ছিল, মেহের আপার গাড়িটা নিয়ে রওনা হলাম আমরা। সিটি ক্লিনিকে ওয়েটিংরুমে ঢুকে দেখি তারিক ভাই ও মোরশেদ খান দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন মোরশেদ খান। তারিক ভাই এগিয়ে এলেন।

'কেমন আছেন মেহের আপা?' ব্যাকুলকণ্ঠে জানতে চাইলাম আমি।

'ডাক্তাররা পরীক্ষা করছেন, একটু পরই জানতে পারব।'

'তারিক ভাই, আমি··· ।'

'থাক, আপনি শান্ত হোন। এখন কিছুই আমি শুনতে চাই না,' বলে সরে গেলেন তিনি। দেখলাম, একটা কেবিনের দরজা খুলে ওয়েটিংরুমে বেরিয়ে এলেন দু'জন ডাক্তার।

স্থির পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এগোতে সাহস পাচ্ছি না। ডাক্তাররা বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন তারিক ভাইয়ের সাথে, তারপর আবার কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁদের পিছু পিছু মোরশেদ খান ও তারিক ভাইও ভেতরে ঢুকলেন।

শরীরটা কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। সোফায় বসে অপেক্ষা করছি। প্রায় বিশ মিনিট পর কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তারিক ভাই। সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'চলুন, বাড়ি ফেরা যাক।'

'মেহের আপা?' ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম। 'কেমন আছেন উনি?'

'এটা আপার অনেক পুরানো রোগ—হিস্টিরিয়া। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'ওঁর মাথায় আঘাত লেগেছে···,' শুরু করলাম আমি।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে তারিক ভাই বললেন, 'ওগুলো তেমন মারাত্মক কিছু নয়, অন্তত ডাক্তাররা তাই বলছেন। হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন মানসিক কারণে···।' শরাফত মিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে এক পাশে, তার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমরা কি গাড়ি নিয়ে এসেছ?'

'জ্বী।'

'ওটা নিয়ে তোমরা ফিরে যাও, আমি শিমুলকে নিয়ে আসছি।'

তারিক ভাই গাড়ি চালাচ্ছেন, ওঁর পাশে বসে আছি আমি। কিছুক্ষণ কেউ আমরা কোন কথা বললাম না। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলাম আমি। প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব বললাম ওঁকে। আকলিমা চাচী এল, ডায়েরীটা দিল আমাকে, ঘরে ফিরে এসে দেখি ডায়েরীটা নেই, সামিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেহের আপার ঘরে ঢুকলাম, ধস্তাধস্তি হলো, জহির ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম। কিছুই বাদ দিলাম না, এমনকি ডায়েরীটা যে পড়েছি তা-ও জানিয়ে দিলাম ওঁকে।

তারিক ভাই একবার শুধু অভিযোগের সুরে মন্তব্য করলেন, 'আমি থাকলে জহির বাড়িতে ঢুকতে পারত না।' থমথম করছে ওঁর চেহারা।

'কিন্তু অন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না, বাধ্য হয়ে তাঁকে আমি··· ।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'তারপর?'

আমার সব কথা শেষ হলো। তারিক ভাই জানতে চাইলেন, 'শারমিনের ডায়েরী···কি লেখা আছে তাতে?'

শারমিনের জীবনকাহিনী এমনই করুণ ও বিপজ্জনক, একবার পড়ার পরই আমার তা মুখস্থ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বললাম, তবে কোন কথাই বাদ পড়ল না। মাঝে মধ্যে বাধা দিলেন তারিক ভাই, প্রায় জেরা করার সুরে প্রশ্ন করলেন আমাকে। প্রথমেই উনি জানতে চাইলেন, ডায়েরীটা কোথায় রেখে এসেছি আমি। বললাম, আমার ঘরে, বিছানার তলায়।

তারিক ভাইকে চিন্তিত মনে হলো, বললেন, 'ফিরে গেলে ওটা পেলে হয়।'

আরেকবার তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমার নিজের বোন! একই মায়ের পেটের আপন বোন! সে আমার এরকম সর্বনাশ করল!'

তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'ডায়েরীটা আকলিমা চাচী পেল কিভাবে?'

তা-ও আমি ব্যাখ্যা করে শোনালাম ওঁকে।

বাড়িতে ফিরে এলাম আমরা। আমাকে নিয়ে সরাসরি আমার ঘরে চলে এলেন উনি। বললেন, 'দিন, আমি ওটা পড়ব।'

বিছানা তুলে ডায়েরীটা বের করব, দেখি নেই। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল আমার। হাঁ করে তাকালাম তারিক ভাইয়ের দিকে। 'এখানেই তো রেখে গেছি! নেই কেন?'

'যা সন্দেহ করেছি তাই,' বলে করিডরে বেরিয়ে গেলেন তারিক ভাই, চিৎকার করে সামিনাকে ডাকলেন। সামিনা নয়, ছুটে এল লতা। 'সামিনা কোথায়?' জানতে চাইলেন তারিক ভাই। 'আমি তাকে ডাকছি।'

'সে তো নেই! খানিক আগে আমাকে বলে গেল, ক্লিনিকে বেগম-সাহেবার কাছে যাচ্ছে···।'

'কে তাকে ক্লিনিকে যেতে বলেছে?' রাগে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তারিক ভাই। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্য সব চাকরবাকররাও জড়ো হয়েছে করিডরে। তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'শিমুলের বিছানার তলায় একটা নোটবুক ছিল, কেউ তোমরা দেখেছ?'

সবাই জানাল, না দেখেনি।

'শরাফত মিয়া, ড্রাইভারকে নিয়ে এখুনি তুমি ক্লিনিকে চলে যাও। সামিনাকে বলবে, আমরা জানি নোটবুকটা সে-ই নিয়েছে। যাও, তার কাছ থেকে চেয়ে আনো সেটা।'

শরাফত মিয়া তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ঘরে ফিরে এসে বিছানার ওপর বসলেন তারিক ভাই। মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছেন। ওঁর জন্যে দুঃখে বুকটা আমার মনে হলো ফেটে যাবে। কি একটা অশান্তিময় জীবন ওঁর। ইচ্ছে হলো সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলি। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে ঘরের সামনে থেকে চাকরবাকররা চলে গেছে। খানিক পর তারিক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে খাবার দিতে বলব?'

'আমার খিদে নেই,' বলে আমার দিকে তাকালেন তারিক ভাই, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন। 'বসুন। আপনার সাথে আমার কথা আছে।'

বসলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন তারিক ভাই, তারপর জানতে চাইলেন, 'ডায়েরীর কথা ওঁরা আমাকে কেউ কিছু বলল না কেন?'

'ওরা···ওরা মানে কারা?'

'মেহের আপা, দুলাভাই, শরাফত মিয়া, সামিনা···সবার সাথে কথা হয়েছে, কিন্তু কেউই ওরা বলেনি যে গোলমালটা ডায়েরী নিয়ে লেগেছিল। কারণটা কি?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম আমি। তারপর বললাম, 'মোরশেদ ভাই বাড়িতে অনেক পরে এসেছেন, ঘটনা ঘটে যাবার পর, ডায়েরীর কথা তাঁকে আমি বলিনি। শরাফত মিয়া আকলিমা চাচীকে রিকশায় তুলে দিতে গিয়েছিল, ঘটনার পর ফেরে সে। লতা ছিল ছুটিতে, জব্বার গিয়েছিল বাজারে, কাজেই ওরাও ডায়েরীটা দেখেনি। আর সামিনা··· সে-ই তো ওটা আমার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায়···।'

'ডায়েরীর কোন কথা তো বললই না,' তারিক ভাই আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

তাকালেন, 'বরং আপনার নামে অভিযোগ করল ওরা।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইলাম আমি। 'কি অভিযোগ?'

'বিশেষ করে মেহের আপা। হিস্টিরিয়ার মধ্যে চিৎকার করছিল, তবে অভিযোগটা স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করেছে।'

'কি অভিযোগ?' আবার আমি জানতে চাই।

'জহিরকে আমি এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করার পর আপনি নাকি নিয়মিত তার সাথে বাইরে যোগাযোগ করেন। আপনাদের দু'জনকে সিনেমায়, মেলায় ও পার্কে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখা গেছে। আপনি নাকি তার বাড়িতেও বেশ কয়েকবার গেছেন…।'

হাসব নাকি কাঁদব বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'মেহের আপার অভিযোগ তো? এ-ধরনের মিথ্যে অভিযোগ উনি তো করবেনই।'

'কারণ?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন তারিক ভাই।

ওকে গম্ভীর হতে দেখে বিস্ময়ে একটা ধাক্কা খেলাম মনে মনে। তারমানে মেহের আপার অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন উনি। বললাম, 'কারণটা পরিষ্কার নয়? মেহের আপা তো প্রথম থেকে আমার বিরুদ্ধে আপনার মনটা বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। উনি যে আমাকে সহ্য করতে পারেন না, আপনিও তা জানেন।'

'তাহলে ওদের এ অভিযোগ আপনি অস্বীকার করছেন?'

'মিথ্যে অভিযোগ অস্বীকার করব না তো কি করব! ওদের…ওদের অভিযোগ মানে? আর কে কি বলছে?'

'দুলাভাই।'

'মোরশেদ ভাই? অসম্ভব! তিনি এ-ধরনের মিথ্যে কথা বলতে পারেন না।'

'কিন্তু বলেছে।' আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন তারিক ভাই।

'যদি বলে থাকেন, মিথ্যে কথা বলছেন,' দৃঢ়কণ্ঠে বললাম আমি। 'আমার ধারণা ছিল, মোরশেদ ভাই মিথ্যে কথা বলার লোক নন। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, মেহের আপাকে সাংঘাতিক ভয় পান তিনি, স্ত্রী জেদ ধরলে তার পক্ষে এধরনের একটা অন্যায় করা অসম্ভব নয়।'

তারিক ভাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, কথা বললেন না। ওঁর চোখে সন্দেহ দেখে গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল আমার। তারপর উনি জানতে চাইলেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি জানেন, জহিরকে আমি এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছি, তারপরও আপনি তাকে ডেকে পাঠালেন কেন?'

'মেহের আপার রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না, ডাক্তার মহসীনকে পাওয়া গেল না, শরাফত মিয়া আমাকে বলল আশপাশে আর কোন ডাক্তার নেই…'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে তারিক ভাই বললেন, 'এ-বাড়িতে দুটো ফোন রয়েছে, ফোনের পাশে টেলিফোন ডাইরেক্টরী আছে। আপনি তো ইচ্ছে করলে হাসপাতাল বা কোন ক্লিনিকে ফোন করতে পারতেন। এত থাকতে আপনার জহিরের কথাই মনে পড়ল?'

বুঝলাম, মেহের আপার কুৎসিত ষড়যন্ত্র পুরোপুরি সফল হতে যাচ্ছে। তারিক ভাইয়ের মনে যে সন্দেহ ঢুকেছে, আমার পক্ষে তা দূর করা সম্ভব নয়। বোকার মত চুপ করে থাকলাম, কি বলব ভেবে পেলাম না।

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন,' ভারি গলায় বললেন তারিক ভাই।

'আমার ভুল হয়ে গেছে,' স্বীকার করলাম। 'এ-সব কথা তখন আমার মাথায় আসেনি।'

'ভুল হয়ে গেছে, নাকি ইচ্ছে করেই আপনি জহিরকে ডেকে পাঠান?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তারিক ভাই। 'মেহের আপা বলল, সে আপনাকে জহিরকে ডাকতে মানা করেছে, কিন্তু আপনি তার কথা শোনেননি।'

'মিথ্যে কথা!' তীব্র প্রতিবাদ জানালাম। 'আমি যখন ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই তখন উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন, মানা করবেন কিভাবে?'

এই সময় ফিরে এল শরাফত মিয়া। তার হাত খালি। 'সামিনা বলল, সে কোন নোটবুক দেখেনি, নেয়ওনি।'

'তাকে তুমি ডেকে আনলে না কেন?' জানতে চাইলেন তারিক ভাই।

'বেগম সাহেবা বললেন, সামিনাকে তাঁর দরকার···।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

শরাফত মিয়া চলে গেল। আমার দিকে তাকালেন তারিক ভাই। 'কে যে সত্যি কথা বলছে, বুঝব কিভাবে? ডায়েরীর ব্যাপারটাও এখন জটিল হয়ে উঠল। ওটার কথা একা শুধু আপনি বলছেন। আর কেউ ওটা দেখেনি পর্যন্ত। যারা দেখেছে বলে দাবি করছেন আপনি, তারা স্বীকার করছে না। আচ্ছা, একবার যখন চুরি হয় ডায়েরীটা, তারপর আপনি কোন বুদ্ধিতে সেটা সবার সামনে বিছানার তলায় রেখে গেলেন? ভয় হলো না, আবার ওটা চুরি হতে পারে?'

'মেহের আপাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম···'

বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তারিক ভাই। 'আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করার কারণ হলো··কারণ হলো, আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। শুধু যে বাণী আর শক্তি আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তা নয়, আমিও আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। আমার একটা পরিকল্পনা আছে···কিন্তু আপনার সম্পর্কে ওরাই মিথ্যে কথা বলছে এটা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত সেটার কথা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শারমিনকে অবহেলা করে জীবনে বিরাট একটা ভুল করেছি, তার মৃত্যুর জন্যে নিজেকেই আমি দায়ী করি। আপনাকে অবহেলা করে বা আপনার কাছ থেকে বেশি সময় চেয়ে নিয়ে একই ধরনের আরেকটা ভুল করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না—আজ বিকেলেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সব কথা আপনাকে আমি বলতে চাই। কিন্তু বাড়িতে ফেরার পর যে পরিস্থিতি দেখলাম···এখন আমাকে সত্যি-মিথ্যে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আশা করি ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন।'

'ওরা সবাই যদি আমার বিরুদ্ধে বলে···' কথা শেষ করতে পারলাম না, নিঃশব্দে কেঁদে ফেললাম।

'কান্না কোন সমস্যার সমাধান এনে দেয় না,' শুকনো গলায় মন্তব্য করলেন তারিক ভাই। 'দুনিয়াসুদ্ধ লোক আপনার বিরুদ্ধে কথা বলুক, তাতে বিচলিত হবার কিছু নেই—সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।' দরজার দিকে দ্রুত এগোলেন তিনি। 'এখুনি আমি জহিরের কাছে যাচ্ছি। দেখি এ-ব্যাপারে তার কি বলার আছে। আর কাল সকালে সামিনাকে আমি ধরব।'

খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, মনে শান্তি নেই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তারিক ভাই। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম, কতটা ভালবাসি ওঁকে আমি। ইতিমধ্যে

পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমার নিষ্কলুষ চরিত্রে যে কলঙ্কের কালিমা লেগেছে তা মোছার সাধ্য আমার নেই। তারিক ভাইয়ের কাছে দুশ্চরিত্রা নারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকব আমি। তবু, নিজের কথা ভাবছি না। ভাবছি ওঁর কথা। ওঁর মনে অশান্তির আগুন জ্বলছে, কল্পনা করে আমিও সেই আগুনে দগ্ধ হচ্ছি। ইচ্ছে হলো উন্মাদিনীর মত ছুটে যাই বাড়ির বাইরে, আছড়ে পড়ি তারিক ভাইয়ের পায়ের ওপর। চিৎকার করে বলি, কিছুই প্রমাণ করার দরকার নেই, আপনি বাড়িতে ফিরে চলুন, শান্ত হয়ে বসুন, বিশ্রাম নিন, একটু ঘুমান। তারিক ভাই, আমি আপনার মুখে হাসি দেখতে চাই। দেখতে চাই আপনি শান্তিতে আছেন।

শরাফত মিয়া আমাকে খেতে ডাকল। বললাম, 'তোমরা সবাই খেয়ে নাও। তারিক ভাই ফিরলে ওঁকে খেতে দিয়ো। আমি খাব না, খিদে নেই।' শরাফত মিয়া কথা না বলে চলে গেল।

বিশ মিনিট পর ফিরে এলেন তারিক ভাই। ভাবলাম, আমার ঘরে আসবেন উনি। কিন্তু এলেন না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলাম, আমার জন্যে ভাল কোন খবর তিনি আনতে পারেননি। পারবেন যে না, আমি তা আগেই জানতাম।

সিদ্ধান্ত নিলাম, ভোর হলেই বিলাসভবন ছেড়ে চুপিচুপি পালিয়ে যাব আমি। এ-বাড়িতে আমার আর থাকা চলে না। ভালবাসি, সে-কথা এ-জীবনে তোমাকে জানানো হলো না, এটাই দুঃখ। এ কেবলই আমার নিজের দুঃখ, কাউকে ভাগ দেয়া যাবে না।

সব ফেলে চলে যাব আমি। ব্যর্থতার জ্বালা ও কলঙ্কের মিথ্যে অপবাদ আমার তেইশ বছরের শুভ্র সুন্দর জীবনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। লজ্জায় কোনদিন আমি আর তোমার সামনে দাঁড়াতে পারব না। জুন মাসের আজ এই সাত তারিখে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী মেয়ে আমি। আজ ভাবি, নিয়তির একি পরিহাস, তোমার সাথে আমার দেখা হলো কেন! আর আমিই বা বোকার মত তোমাকে পেতে চাইলাম কেন! আগে কেন বুঝিনি, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না?

সাত

সুজলা সুফলা শিমুলিয়া। আমার ছোট্ট সোনার গাঁ, আদরিণী মা আমার। কলকল ছলছল করে কার গান গাও তুমি, বংশী? বংশী তুমি কার নদী? তোমার বুক বেয়ে ওরা কারা আসে গো?

আজ চোদ্দ দিন হলো গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছি আমি। বাড়ি বলতে মাঝারি একটা চারচালা, ছোট একটা দোচালা, মাঝখানে সামান্য উঠন, ভিটের একধারে তিন চার বিঘা ধান জমি। বছরে যা ফলন হয়, সবই ভোগ করে বিধবা কালার মা। কালা তার একমাত্র ছেলে, গ্রামে ফিরে শুনি সে-ও শহরে চলে গেছে। আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা বুড়ি—কি খাওয়াবে, কিভাবে যত্ন নেবে ভেবেই অস্থির। কালার মাকে আমি চাচী বলি। খুব খাটতে পারে, দেখলাম ভিটের চারধারে প্রচুর শাক-সব্জি ফলিয়েছে। নদীর কিনারায় বাড়ি, মাছেরও কোন অভাব নেই।

প্রথম দু'দিন বাড়ি থেকে বের হইনি। তৃতীয়দিন থেকে পাড়া বেড়িয়ে সময়

কাটাচ্ছি। আজ থেকে শুরু হলো আমার প্রহর গোনা। অপেক্ষার পালা।

গ্রামে আমার এক পুরানো বান্ধবী আছে, অঞ্জলি। অঞ্জলি বিবাহিতা, স্বামী থাকে মধ্যপ্রাচ্যে। কাল আমার সাথে দেখা করতে এসে দেখে, আমি শুয়ে আছি। 'কি গো সই, কার বিরহে আনমনা? শুনলাম একা এসেছ? এতদিন শহরে রইলে, একটাকে ধরে আনতে পারলে না?'

'কাল হয়তো আসবে,' বলেই হকচকিয়ে গেলাম। ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। এ আমি কি বললাম? কেন বললাম? আমার ভাব-সাব দেখে অঞ্জলি তো হেসে কুটিকুটি।

সারাটা দিন রইল অঞ্জলি, সময়টা তার সাথে ভালই কাটল। নদীতে গোসল করলাম, গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেলাম। অঞ্জলি চলে যাবার পর নিজেকে আসামী করে বসলাম জেরা করতে।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে প্রথমে আমি কচির হোস্টেলে যাই। গিয়ে শুনি বন্ধুদের সাথে যশোরে গেছে সে, তবে কালই ফিরবে। আমি আর তার জন্যে অপেক্ষা না করে একটা চিঠি রেখে চলে এলাম সরাসরি গ্রামে। গ্রামে আসার পর দু'দিন শুয়ে-বসে কাটিয়েছি, রোমন্থন করেছি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া গত এক বছরের ঘটনা। দূরে সরে আসার পর আগের চেয়েও পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমার জীবনে তারিক ভাইয়ের কোন বিকল্প নেই। ভাল মানুষ একজনকেই বাসে। আমার সমস্ত ভালবাসা আমিও একজনকে অকুণ্ঠচিত্তে দান করে নিঃশেষ হয়ে গেছি, আর কাউকে দেয়ার মত কিছু নেই আমার কাছে। এই দু'দিন আবোল-তাবোল অনেক কথাই ভেবেছি। ভেবেছি, কেমন আছেন তিনি? কেমন আছে আমার দুই লক্ষ্মী সোনা, বাণী ও শক্তি? কান্না পেয়েছে, বোধহয় কেঁদেছিও। ইচ্ছে হয়েছে আবার ছুটে যাই ওঁর কাছে, নিজেকে নিষ্কলুষ বলে দাবি করি। কিন্তু না, উপলব্ধি করেছি, আমার আর ফেরা চলে না। এ-সব আবেগময় ভাবনাগুলো যখন আসা-যাওয়া করছে মনের ভেতর, তখনই সতর্ক ও বাস্তবতা-প্রিয় মাথার ভেতর একটা হিসাব শুরু হয়ে গেছে, কখনও চেতন মনের প্ররোচনায়, কখনও অবচেতন মনের তাগাদায়। সেই হিসাবটাই অসতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে এসেছিল অঞ্জলির প্রশ্নের উত্তরে।

হিসাবটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার। তারিক ভাইয়ের কথাই ঠিক। সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। আমি যেদিন চলে এসেছি সেদিনই সামিনাকে জেরা করবেন উনি। চেপে ধরবেন মোরশেদ খানকে। ওর জেরার মুখে সত্যি কথা না বলে পারবে না ওরা। অন্তত মোরশেদ খান এক পর্যায়ে ভেঙে পড়বেনই। তারিক ভাই জানবেন, জহির ডাক্তারের সাথে জড়িয়ে আমার সম্পর্কে যে অপবাদ ছড়ানো হয়েছে তা সত্যি নয়। সামিনার কাছ থেকে নোটবুকটাও উদ্ধার করতে পারবেন, যদি সেটা নষ্ট করা না হয়ে থাকে। অন্তত একটা নোট বুকের অস্তিত্ব যে ছিল, এটা জানতে পারবেন উনি। ধরা যাক, এ-সব জানতে সাত ও আট তারিখ, এই দু'দিন লাগবে ওঁর। এরপর আমার খোঁজ শুরু করবেন। সত্যি করবেন কি? কেন আমার খোঁজ করবেন? আসলে এটা আমার একটা গোপন হিসাব, যুক্তি ও কারণগুলো অকাট্য নয়। ভালবাসার একটা শক্তি থাকে, সেই শক্তি আমাকে আশা করতে সাহস যোগাচ্ছে। তিনি আসবেন। আমাকে খুঁজবেন। আর কিছুর জন্যে যদি না-ও হয়, অন্তত ক্ষমা চাওয়ার জন্যে একবার ওঁকে আমার কাছে আসতেই হবে।

কিন্তু আসবেন যে, ঠিকানা কোথায় পাবেন? আমি তো কোন ঠিকানা রেখে আসিনি। কচি কোথায় পড়ে তা উনি জানেন, কিন্তু কোন্ হোস্টেলে থাকে তা জানেন না। এমনকি

শিমুলিয়ায় যে আমাদের একটা বাড়ি আছে, তা-ও ওঁকে কোনদিন আমি জানাইনি।

তবে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়ই। লিট্‌ল ফ্লাওয়ার্সে পড়াতাম আমি, তারিক ভাই জানেন। স্কুলে খোঁজ করলে আমাদের শিমুলিয়ার ঠিকানা পেয়ে যাবেন। ধরা যাক, আরও একদিন লাগবে ঠিকানাটা যোগাড় করতে। দশ তারিখে যদি ঢাকায় আসেন ওঁ, শিমুলিয়ায় পৌঁছুবেন এগারো তারিখে।

এল সেই এগারো তারিখ। আমার প্রহর গোনা শুরু হলো। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

ঘাটটা বাপ-দাদা আমলের তৈরি, বাড়ির সামনেই। সেই ঘাটে বসে আছি একা। বংশী আমাদের এখানটায় যথেষ্ট চওড়া। তিনশো গজ দূরে হঠাৎ বাঁক নিয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেছে নদী। যে ঘাটে বসে আছি, এটাকে আমাদের পারিবারিক ঘাটই বলা যায়। সরকারী ঘাটও আছে, তবে সেটা ওপারে। লঞ্চ, স্টিমার, নৌকো, সব ওপারেই ভেড়ে। লঞ্চ থেকে নেমে নৌকো নিয়ে এপারে আসতে হয় আমাদের, এপারের লোকদের।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গাড়িয়ে সন্ধে। এখনও নদীর বাঁকটা দেখতে পাচ্ছি। এদিকে অনেক নৌকোই আসছে, তবে সেগুলোর দিকে আমার মনোযোগ নেই। চাতক পাখির মত তাকিয়ে আছি যদি কোন লঞ্চ বা স্টিমার দেখতে পাই। দুপুর থেকে মাত্র দুটো লঞ্চ আর একটা স্টিমার এসে ভিড়েছে ওপারে। নৌকো নিয়ে এপারে কেউ আসেনি। প্রায় দু' তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, আর কোন লঞ্চ বা স্টিমার আসছে না। জানি তারিক ভাই এলে লঞ্চ বা স্টিমারেই আসবে।

চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। দু'বার ডাকতে এসে ফিরে গেছে কালার মা। ওপারে ইতিমধ্যে একটা লঞ্চ এসেছে, কিন্তু ওপার থেকে এপারে কোন নৌকো আসেনি। নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, হিসাবটা তোমার পুরোপুরি নিখুঁত নয়, দু'একদিন এদিক ওদিক হতে পারে। রাত আটটার দিকে ফিরে এলাম ঘরে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম, কাল আবার ভোর থেকে ঘাটে আমাকে বসতে হবে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর মনে হলো, আজ তিনি আসবেনই। অনুভব করলাম, এ আমার ভালবাসার শক্তি। আমার ভালবাসা যদি সত্যি হয়, তারিক ভাইকে আমার কাছে আসতেই হবে।

কিন্তু বারো তারিখও পেরিয়ে গেল। তারপর চোদ্দ তারিখও। ধীরে ধীরে কঠিন বাস্তবতা স্পর্শ করছে এবার আমাকে। ঢাকা থেকে শিমুলিয়া আসার পথে মনে মনে একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। জীবন তো থেমে থাকার নয়। যতদিন না মরি ততদিন এই বোঝা তো বয়ে বেড়াতে হবে। লঞ্চে বসে ঠিক করে ফেলছিলাম কি করব। শহরে আর কোনদিনই ফেরার ইচ্ছে নেই আমার। লেখাপড়া শিখেছি তো কি হয়েছে, গ্রামেও সেটা কাজে লাগানো যায়। বরং গ্রামেই আরও ভালভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। মেয়েদের একটা স্কুল খুলব আমি। শিমুলিয়ায়, আমাদের অজ পাড়াগাঁতেই। কি আয় হবে না হবে সেটা কোন চিন্তার বিষয় নয়, কারণ একা একটা মানুষের কতই বা খরচ হতে পারে। জমিজমা একেবারে যে নেই তা তো নয়। বাকি জীবনটা স্কুল শিক্ষিকা হিসেবে কাটিয়ে দিতে পারলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।

সেই পরিকল্পনাটা এবার মনের ভেতর ডালপালা ছড়াতে শুরু করল। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলোচনা করলাম, দেখলাম ছাত্রীর কোন অভাব হবে না। আরও দু'দিন পেরিয়ে গেল। সমস্ত আশা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজে নেমে পড়লাম আমি। কচিকে নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা ছিল, আমার চিঠি পেয়েও সে কোন খবর নিল না। সে

দুশ্চিন্তাও সতেরো তারিখে দূর হলো। ভোর বেলা হাজির সে, এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল চারচালাটা মেরামত করার কাজে, আমার সাথে ভাল করে কথা বলারও ফুরসত পায় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার বল তো? হঠাৎ ঘর ঠিক করছিস কেন? বিয়ে করবি নাকি?'

আকাশ থেকে পড়ল কচি। 'বিয়ে? আমি? কি বলছ? তুমি না আমার বড়? তার ওপর মেয়ে! আগে তো তোমার, তারপর আমার কথা ভাবা যাবে।'

'তাহলে যে ঘর ঠিক করছিস? এত টাকাই বা তুই পেলি কোথায়?'

'ও, এই কথা। কেন, তোমাকে বলিনি? আমার পনেরো বিশজন বন্ধু আসছে শিমুলিয়ায়, ঘাটে বসে ছবি আঁকবে। গোটা আয়োজনটা করা হয়েছে চাঁদা তুলে, টাকার কোন অভাব নেই আমাদের। দু'হপ্তা থাকবে ওরা।

পরদিন থেকেই শুরু হলো কচির বাজার-হাট। ওর কাজ ও করুক, আমি আমার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম, আমাদের চারচালাটাই স্কুল ঘর হিসেবে ব্যবহার করব। অর্থাৎ ক্লাস শুরু করতে পারব দিন পনেরো পর থেকে। কচির বন্ধুরা বেড়িয়ে যাবার পর। কাজে নেমে দেখলাম, ছাত্রী পাওয়া যাবে অনেক, কিন্তু তারা কেউ বেতনও দিতে পারবে না, বইও কেনার সামর্থ্যও নেই। কুছ পরোয়া নেই, প্রথম দিকে কয়েকজনকে নিজেই আমি বই-খাতা কিনে দেব।

বিশ তারিখে অর্থাৎ আজই আসার কথা ওদের। ভাই আমার ভয়ানক ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই বারবার ঘাটের দিকে ছুটে যাচ্ছে, দেখছে বন্ধুরা আসছে কিনা। ছুটে যাচ্ছি আমিও, কিন্তু কেন যাচ্ছি তা আমি নিজেও জানি না। শুধু আজ নয়, রোজই আমি সারাদিনে পাঁচ-সাতবার ঘাটে এসে বসি, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি, তারপর মন খারাপ করে ফিরে যাই ঘরে। এরকম কেন করি বলতে পারব না। তারিক ভাই যে আসবেন না, এতদিনে সেটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু তবু মনটাকে মাঝে মধ্যে মানাতে পারি না। ওঁর কথা ভাবলেই উতলা হয়ে পড়ি, ছুটে চলে আসি বংশীর কাছে।

আজও সেইরকম চলে এসেছি।

বংশী, তুমি কার নদী? কেমন নদী গো তুমি, মানুষকে শুধু অপেক্ষা করিয়ে রাখো? এত লোককে বুকে করে বয়ে আনো, ওঁকে আনতে পারো না?

আমার পাশে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল কচি। কখন যে ঘাটে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে ও, টেরও পাইনি। চিৎকার জুড়ে দিল ও, 'আসছে, শালারা আসছে!'

নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওমা, একটা লঞ্চ দেখি সরাসরি আমাদের ঘাটেই আসছে। লঞ্চে খোলা ডেকে কচি বয়েসী অনেকগুলো ছেলেকে দেখলাম। কাউকে চিনি, কাউকে এই প্রথম দেখছি। হাসছে সবাই, হাত নাড়ছে। আনন্দে উচ্ছ্বাসে অস্থির হয়ে আছে সবাই।

সবাই আসে, কিন্তু সে আসে না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়ালাম। যাই, দেখি, কচি ওর বন্ধুদের জন্যে আপ্যায়নের কি ব্যবস্থা করেছে। এ ভালই হলো, ক'টা দিন নিজেকে ব্যস্ত রাখা যাবে।

'ও কি? তুমি চলে যাচ্ছ কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কচি। 'আমার বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানাবে না?'

হেসে ফেললাম। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি না।'

দাঁড়িয়ে আছি ঘাটে। লঞ্চটা ভিড়ল। লাফ দিয়ে নামছে ওরা। আমাকে দেখে সামান্য একটু লজ্জা পাচ্ছে, কারণ কচির বড় বোন আমি, ওদেরও তো বড় বোন। আমাকে পাশ

কাটিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল কয়েকজন, সালাম করল আমাকে। দু'একজন জানতে চাইল, কেমন আছি আমি। বন্ধুদের সাথে গলা ছেড়ে হাসাহাসি করছে কচি। লঞ্চ প্রায় খালি হয়ে এল। নদীর দিকে পিছন ফিরলাম, ফিরে আসছি বাড়ির দিকে। নিজেকে হঠাৎ আমার খুব ক্লান্ত লাগল। কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল, অন্যমনস্ক ছিলাম বলে খেয়াল করিনি প্রথমে। তারপর দ্বিতীয়বার শুনলাম ডাকটা।

কচি ডাকছে। 'শিমুল আপা, চলে যেয়ো না, দাঁড়াও!'

ফিরলাম আমি, ঘাটের শেষ ধাপে দু'জন বন্ধুর সাথে কথা বলছে কচি। ওদেরকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল আমার দৃষ্টি। ওমা! এ কি দেখছি আমি! কচি তো বলেনি আমাকে যে ওর বান্ধবীরাও আসবে। আমার চেয়ে বয়েসে দু'চার বছরের ছোট হলেও শাড়ি পরেছে ওরা দু'জনেই। লঞ্চ থেকে নামেনি, খোলা ডেকের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা ডেকে বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন ছেলে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে সুটকেস। যেভাবে সবাই একদিকে কাত হয়ে আছে, বেশ বোঝা যায় খুব ভারি ওগুলো। ছবি আঁকবে, বোধহয় তারই সরঞ্জাম আছে ভেতরে। তাই বলে এতগুলো সুটকেসে?

'কি রে কচি, আমাকে ডাকলি কেন?'

কচি হাসছে, ওর হাতে একটা ক্যামেরা দেখলাম। আমার দিকে নয়, তাকিয়ে আছে লঞ্চের দিকে। হাসতে হাসতেই বলল, 'আরেকটু দাঁড়াও, শিমুল আপা। আমার বান্ধবীদের সাথে তোমার ছবি তুলব।'

হেসে ফেললাম। 'ছবি তুলবি তো ওদের আসতে বল! তাড়াতাড়ি কর, আমাকে আবার তোদের নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে যে।'

'এই, তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন, নেমে এসো,' মেয়ে দুটোকে তাগাদা দিল কচি।

আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে হাসাহাসি করল মেয়ে দুটো, তারপর মাঝখানে তিনজনকে নিয়ে নেমে এল লঞ্চ থেকে। স্থির পাথর হয়ে গেলাম আমি। শরীরটা এত হালকা হয়ে গেল, মনে হলো আমার অস্তিত্বের কোন ওজন নেই—ইচ্ছে করলে আমি মেঘ হয়ে ভাসতে পারি আকাশে, ঘুড়ির মত উড়তে পারি, মিলিয়ে যেতে পারি বাতাসে। আমার প্রতিটি অণু-পরমাণু পুলক আর রোমাঞ্চের এক একটা আধার হয়ে উঠল। কি এক নেশায় আমি যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। মনে হলো আমি জেগে নেই, যা কিছু ঘটেছে স্বপ্নের ভেতর ঘটছে। দেখলাম ঘন কুয়াশা ভেদ করে একটা সাম্পান এসে ভিড়ল আমার তীরে। সাম্পান থেকে নামল আমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার।

ঘাটের ধাপ বেয়ে কখন উঠে এসেছে আমার লক্ষ্মী সোনারা, যেন চোখের পলকে। আমার তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল বাণী। তারপর পিছন ফিরল। ওকে পিছন ফিরতে দেখে ব্যথায় টন টন করে উঠল বুকটা। অভিমানী গলায় বাণী বলল, 'তোমার সাথে আমি কথা বলব না!' ফোঁপাতে শুরু করল ও। 'তোমার সাথে আমার আড়ি, আড়ি, আড়ি···!' ফুপিয়ে কাঁদছে, আড়ি দিচ্ছে আর পিছিয়ে সরে আসছে আমার দিকে। আমার বাড়ানো দু'হাতের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। বুকে তুলে নিয়েছি, এত জোরে চেপে ধরেছি যেন ওকে আমি আমার বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখতে চাই। এখনও ফোঁপাচ্ছে ও, বলছে, 'তোমার সাথে আমি কথা বলব না—আড়ি, আড়ি, আড়ি···।' ওর চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে আমার মুখ। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছি আমি ওকে।

'আমাকেও কোলে নাও!' আরেকটা কচি কণ্ঠ শুনতে পেলাম, বাণীর প্রতিদ্বন্দ্বীর। একহাতে তাকেও টেনে নিলাম বুকে।

কচির বান্ধবীরা এগিয়ে এল। টক বড়ুই আর ডাঁসা পেয়ারার লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল ওদেরকে।

চোখ তুলে তাকালাম। নদীর ঘাট খা খা করছে। দাঁড়িয়ে আছি একা শুধু আমরা দু'জন। সারা দেহমনে অসম্ভব কাঁপুনি, আমি ভাবছি, কে বলল স্বপ্ন সত্যি হয় না? কে বলল, আমি একা? এ আমি জানতাম, আমার হিসেবে ভুল হবার নয়।

'কেমন আছেন?' ওঁর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। 'কিভাবে ক্ষমা চাইব ভাবতে ভাবতে ক'টা দিন দেরি হয়ে গেল,' বললেন তারিক ভাই। 'তারপর···সব শোনার পর কচির বন্ধুরা জেদ ধরল ওরাও আসবে, তাই···।'

আমি বললাম, 'এখনও আমাকে আপনি আপনি করবেন?'

'তুমি বলব কোন অধিকারে, যদি না তোমার ক্ষমা পাই আমি?' আমার দেবতাকে উদ্বিগ্ন দেখলাম, হাসছে না। 'সেদিন রাতে তোমার সাথে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেছি আমি। বলো, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?'

'ছি, এ-কথা বলবেন না। আপনি কখন অপরাধ করলেন যে ক্ষমা চাইবেন আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম, সে-ভুল আপনার একদিন না একদিন ভাঙবেই। আপনি যে আসবেন, এ-ও আমি জানতাম।'

'সত্যি জানতে? সত্যি আশা করেছিলে···?'

'কেন জানব না! কেন আশা করব না। আপনিই তো সেদিন রাতে বললেন, সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।'

'হ্যাঁ, সত্য কোন দিন চাপা থাকে না। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি, পরদিন সকালে দুলাভাই নিজেই সব স্বীকার করলেন। মাফ তো চাইলেনই, মেহের আপার কাছ থেকে নিয়ে নোটবুকটাও তুলে দিলেন আমার হাতে। ওরা কেউ আর বিলাসভবনে ফিরছে না, শিমুল। ফিরছি না আমরাও। আমরা ঢাকায় থাকব। ঠিক করেছি বিলাসভবন বিক্রি করে দেব। কিন্তু তুমি যে এখনও আপনি আপনি করছ আমাকে?'

হেসে ফেললাম। 'আমি বোধহয় কোনদিনই আপনাকে তুমি বলতে পারব না। আপনি আমার প্রিয় গায়ক, আপনাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি···।'

'আমার এ প্রস্তাব পাবার পরও যে আমি তোমাকে বাণী ও শক্তির মা হিসেবে দেখতে চাই?' ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন তারিক ভাই।

'জ্বী?'

'তুমি আমাকে ভালবাস, আমি জানি। কিন্তু তুমি জানো কি, আমিও তোমাকে ভালবাসি, শিমুল?'

মনে মনে বলি, না জানলে তোমার অপেক্ষায় রোজ ঘাটে বসে থাকব কেন!

কচির দুষ্ট বন্ধুরা টেপ রেকর্ডার অন করল, ভেসে এল আমার নিজের গলার আওয়াজ—

'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে···।'

—০—